প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭১

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
হাশেম খান

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

মূল্য আট টাকা

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর
মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ্

স্বাধীনতা-উত্তরকালের কাব্য-পরিস্থিতি ৯
নতুন নাট্য-নিরীক্ষা ১২
আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে যুগচেতনা ২৪
আমাদের অনুবাদ সাহিত্য—প্রবন্ধ ২৭
আমাদের অনুবাদ সাহিত্য—কবিতা ২৯
উদ্দীপনামূলক কবিতা ৩৩
আমাদের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ৩৮
আমাদের কাব্য-সাহিত্যে নগর-জীবনের আলেখ্য ৪০
আমার দেশ : বিপর্যয়ের আলোকে ৪৬
তিমির হননের গান ৪৯
রূপালী স্নানের কবি ৫২
উপান্তের কবি ৬৩
সাংবাদিক কবি ৬৭
দুটো পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস ৭১
একটি উচ্চাভিলাষী উপন্যাস ৭৬
প্রাচ্যের রহস্য নগরী ঢাকা ৮০
একটি স্মৃতিকথা ৮৩
ঐতিহ্যের সাম্প্রতিক ব্যবহার ৮৬
পুনরুজ্জীবিত রবীন্দ্রনাথ ৯২
কাব্যে আধুনিকতা : লক্ষণ ৯৬

স্বাধীনতা-উত্তরকালের কাব্য-পরিস্থিতি

তিনটি সুস্পষ্ট ধারা নিয়ে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে স্বাধীনতার যুগে উপনীত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্য-চেতনা, সমাজ ও সমাজবাদী চেতনা এবং যুগ ও ব্যক্তি-চেতনা আমাদের কাব্য-সাহিত্যের এই তিনটি ভিন্ন খাতকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মুসলিম ঐতিহ্য ও সমাজবাদী ধারা দুটো আদর্শভিত্তিক। যুগ ও ব্যক্তিসচেতন ধারাটি নির্দিষ্ট কোন আদর্শভিত্তিক নয়। অপরপক্ষে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী ধারাটি ধর্মকেন্দ্রিক, কিন্তু সমাজ ও সমাজবাদ এবং যুগ ও ব্যক্তিচেতনা ধারা দুটো ধর্ম-নিরপেক্ষ। কিন্তু এই তিনটে স্রোতের মধ্যেই যে বিষয়টা সাধারণ সেটা হল তাৎপর্য-সজাগতা। বিষয়ের ক্ষেত্রে সূত্র এবং পারম্পর্য বা পূর্বাপর সম্পর্কের বা পরিস্থিতির ভিত্তি নির্ধারণের প্রতি সহজাত প্রবণতা। একে আমরা সামগ্রিকভাবে প্রেক্ষিত-চেতনা বলে উল্লেখ করতে পারি। বর্তমান যুগের কবিতা আদর্শ-অনাদর্শ ধর্ম-অধর্ম আশা-হতাশা প্রশান্তি-বিভীষিকা গ্রাম-নগর নিয়ে যে-খাতেই প্রবাহিত হোক না কেন এই মূল গুণটি বিবর্জিত হলে তাকে আমরা যুগোপযোগী আখ্যা দিতে পারি না। এ কথাটা এতদূর সত্য যে, এমন কি এখনকার বিমূর্ত প্রেমের কবিতাতেও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির মধ্যে এই তাৎপর্যমুখী স্বভাবের সহজাত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

এ ক্ষেত্রে আমার প্রথম বলবার কথাটি এই যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত কালে আমাদের কাব্য-সাহিত্য যুগোপযোগী চারিত্র অর্জন করেছিল এবং তা অগ্রসরমানতায় অব্যাহত হওয়ার উপযোগী তিনটি সুস্পষ্ট ভিত্তিও পেয়ে গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় কথাটি এই যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালের কবিতার বেলায় উপরোক্ত সত্য ঠিক পুরোপুরি প্রয়োগ করা যায় না। বর্তমানকালের উপযোগী কাব্যের মূল চারিত্র্য যে প্রেক্ষিত-চেতনা বলে উল্লেখ করেছি তা অবশ্য স্বভাবগতভাবে স্বাধীনতা-উত্তর-

কালের কাব্যেও রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত মুহূর্তে আমাদের কাব্যের অগ্রসরমান যে তিনটি ধারা অব্যাহত ছিল· তা যেন আর পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট নেই। এমন কি নতুনতর কোন একটি ধারাও অবলম্বন করেনি। মনে হয়, স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কবি-স্বভাবসম্পন্ন তরুণদের কাব্য-উদ্যমে প্রধান যে উদ্বেগ ছিল, তা হল আত্মপ্রতিষ্ঠার। এইটেই মনে হয় তাঁদের কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে কারণে তাঁদের মনোযোগ যে পরিমাণে আঙ্গিকের দিকে, শব্দের দিকে, কাব্য-সৌন্দর্যের দিকে এবং চমৎকারিত্বপূর্ণ বক্তব্য বা উক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে সে পরিমাণে নিজস্ব স্বভাব ও যুগ-স্বভাব অনুযায়ী বিষয়ের সমন্বিত ভিত্তিতে আত্মবিকাশের দিকে আকৃষ্ট হয়নি। বা মনোযোগ আকৃষ্ট হলেও, বা এ ব্যাপারে সজাগ থাকলেও তেমন তৎপর হয়ে, সক্রিয় হয়ে এ সমস্যার মোকাবেলা করতে তাঁরা পারেন নি। কাব্যের বাধাবোল নিজেদের মুখে বিশিষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন, নিজের বা যুগের বিশিষ্টতা ফুটানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় না গিয়ে। এক্ষেত্রে কবির আত্মসংগ্রাম বিদূরিত হয়েছে, স্থান করে নিয়েছে কবির আত্মসংযোজনের প্রবণতা। পূর্বতন অগ্রসরপ্রবণ ধারাসমূহের ছিটেফোঁটা তরুণদের কারো কারো মধ্যে আছে, কিংবা ব্যতিক্রম হিসেবে পূর্বতন ধারা অনুসারী দু'একজন কবি-কর্মীকেও পাওয়া যাবে, কিংবা দু'একজনের মধ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত সঙ্কটও লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালের কাব্য-পরিস্থিতিতে আঙ্গিক সর্বস্বতার তথ্যটাই সত্য বলে মনে হয়। ফলে, স্বাধীনতা-উত্তরকালের কাব্য-উদ্যমে বিকাশ যদি কিছু হয়ে থাকে তা হয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তে। অতিরিক্ত পরিভ্রমণে এই বৃত্ত চকচকে হয়েছে এইমাত্র যা। আমাদের শব্দসম্পদের জৌলুষ বেড়েছে, কোন কোন কবি কাব্য-রচনায় আরো পাকা হয়েছেন, কিন্তু গত পনেরো বছরের কাব্য-আন্দোলনের পরিণত ফলটি কী, ধারণাগত, চেতনাগত, মানবগত, এমনকি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-গত অগ্রগতির পরিচয়টা কী এতে বিধৃত—এ কথার কোন সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া দুরূহ।

আধুনিক স্বভাব থাকা এক কথা, সেই স্বভাব অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার ভিত্তি পাওয়া ভিন্ন কথা। স্বাধীনতার মুহূর্তে আমাদের কাব্যের এ দুটো সামর্থ্যই ছিল এবং এর পরিণত বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনাও আশা করা গিয়েছিল। অপরপক্ষে স্বাধীনতা-উত্তরকালে কাব্য-সাধনা আমাদের যা

উপহার দিয়ে চলেছে তার আধুনিক রুচি, মেজাজ ও মৌলস্বভাব রয়েছে ঠিকই, কিন্তু অগ্রগতির সেই অর্জিত ভিত্তিটাই কই? মূল মেরুদণ্ডটাই যেন ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে। ফলে পরস্পরের ঐক্য দেখতে পাচ্ছি আমরা পরস্পরের প্রভাবের মধ্যে। ভঙ্গী, শব্দপ্রয়োগ ও ভাষা ব্যবহারে পরস্পরকে প্রাণপণে অাঁকড়ে ধরার মধ্যে। তাই সম্প্রতিকালের কবিতা বড্ড বানানো। তা কতটুকু স্বজনী আলেখ্য? কতটুকুই বা উদ্বুদ্ধ কবির অন্তরাত্মা উদ্ভূত? কিংবা কোথায়ই বা সেই পরিপার্শ্ব সংলগ্ন যন্ত্রণা মথিত কবি-স্বভাবের অপরিহার্য হৃদয় আলেখ্য যা কবি না লিখে পারেন না? সমস্ত মনপ্রাণের রসে, সমস্ত আকাশ আলো মাটিতে বেঁচে থাকার দ্যোতনায় অনিবার্য হয়ে যে হৃদয়ের ফুল ফোটে, কোথায় তা?

একটি কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে এখানে উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করি যে, কবিতা লোক ও লোকোত্তরের প্রয়োজন একই সঙ্গে মেটায়। শিল্পেই শুধু-মাত্র এই সমন্বয় সম্ভব। লোকের প্রয়োজন মেটায় বলে লোক তা গ্রহণ ক'রে এসম্পর্কে আগ্রহী হয়। লোকোত্তরের প্রয়োজন মেটায় ব'লে লোকে এতে নির্বিশেষ আনন্দ খুঁজে পায়। এ সমন্বয় যথাযথ না হলে সার্থক কাব্যও হবে না। এ-ক্ষেত্রে ব্যর্থ কাব্যকে হয়তো এর এক কারণে লোক গ্রহণ করে না, নয়তো অন্য কারণে তা চিরকালীন নির্বিশেষ আনন্দের বস্তুতেও পরিণত হতে পারে না। আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর-কালের কাব্য যেন শুধু নিরঙ্কুশ চিরকালীন আনন্দের বস্তু হতেই চেয়েছে, নিরঙ্কুশ শিল্পমাত্র হতেই যেন তার বাসনা। সব দায় এড়িয়ে চিরায়ু হওয়ার উচ্চাশা মেটানোর মত উদার কে? যুগ, না লোক? না, মাটি? মাটিও অতখানি উদার নয়। ফলে, আমাদের স্বাধীনতা-উত্তরকালের কাব্যের পা যেন মাটি থেকেই আলগা হয়ে গেছে। কবিরা আর কোবিদ নন, বরং সাধারণ ভাবে শব্দ তৈরীর প্রতিভায় যেন পর্যবসিত হয়েছেন মাত্র।

তবে আশার কথা এই যে, আমাদের বর্তমান কাব্যের এই ভূমি-অসংলগ্নতার সমস্যা অতিসাম্প্রতিককালে অনেককেই নাড়া দিয়েছে বলে মনে হয়। ফলে প্রবীণ নবীন কেউ কেউ এ সমস্যার মোকাবেলায় অগ্রসর হয়ে আসছেন বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাব্যের চারা মাটি থেকেই উঠুক, দেশ, কাল ও লোকের শিকড় থাক আমাদের কাব্যে এই যেন তাঁরা চাইতে শুরু করেছেন। এইটে আশার কথা এবং এই আশার দিকেই মুখ ফিরিয়ে আছি।

নতুন নাট্য-নিরীক্ষা

চিরকালীন ব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীই সবচেয়ে অগ্রসর। এই নাটকে যে প্রকরণ অনুসৃত তা হলো নিরঙ্কুশ কল্পনার আধারে বাস্তবতার সংস্থাপন এবং সাংকেতিকতায় (Incentive) বক্তব্যের বিকাশ। এমন আঙ্গিকে অবলীলা রয়েছে, বিষয় ও বক্তব্যের সহজ বিকাশও এতে অনাহত। ফলে নির্দিষ্ট কালসীমা এবং লক্ষ্য নিবদ্ধটির মধ্যে রক্তকরবীর তাৎপর্য নিঃশেষিত হওয়ার বিপদ অবসিত হতে পেরেছে। একটি কালজয়ী নাটকের গুণার্জনে রক্তকরবীর এই বৈশিষ্ট্যময় রূপায়ণ-নিরীক্ষা ফলপ্রসূ প্রমাণিত এবং এতে ব্যবহৃত রক্তকরবীর প্রতীকটি নাটকের দ্যোতনাকে দেশজ সংবেদনশীলতায় শিকড়-বদ্ধ ও সম্প্রসারিত করতে পরিচয়-ঘন পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। বিশেষত রক্তকরবী এমন একটা প্রতীক যা স্থায়ী, একে অতিক্রম করা যায় না। এর ব্যঞ্জনায় বিবর্তনধর্ম নেই, রূপান্তরের গতি নেই। অপরিবর্তনীয় এবং মৌলিক এর গুণ, প্রতিফলন এবং দ্যোতনা। রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও স্থায়ীকেই সমর্থন জানিয়েছে। তাঁর উদ্দিষ্ট প্রতিপাদ্যে মৌলিক শক্তিই অগ্রসরমান বিদ্রোহী চেতনার নিয়ামক, শুধু নীতি পাল্টানোর সংশোধনী শর্ত মাত্র এতে সংযোজিত, রূপান্তর নয়, বিবর্তন নয়, এমন কি পরিবর্তনও নয়। থিসিস এবং এন্টিথিসিসের দ্বন্দ্বে এন্টিথিসিসের আবির্ভাবে সিনথিসিসের জয়বার্তা এতে ঘোষিত হয়নি, থিসিসেরই নব-প্রতিষ্ঠা এতে ঘটেছে। সুতরাং বলা চলে, সামাজিক বিবর্তনমুখী চেতনার প্রতিনিধিত্বশীলতায় রক্তকরবীর ভূমিকা সীমাবদ্ধ। এর অগ্রসরমানতার লক্ষণ এবং মূল সাফল্য হলো নাটকের বিষয় ও বক্তব্যের উপর শিল্পের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে, চিরঞ্জীব আঙ্গিকের আয়ত্তে উপকরণ ও প্রতিফলনের সংস্থাপনায়। এই দুটো কাজ সমাধা হয়েছে কল্পনার স্বাধীনতায় বাস্তবের বিমূর্তকরণে এবং

সাংকেতিকতার অমরতায় বক্তব্যের সঞ্চরণে। ফলে রক্তকরবী সামাজিক অগ্রসরচেতনার প্রতিভূ এবং বিবর্তনশীল উপজীব্যের প্রবর্তক না হতে পারে, কিন্তু যে আঙ্গিকে শিল্প চিরজীবী হয় তার উদ্ভাবক-প্রতীক এ হয়ে উঠতে পেরেছে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে রক্তকরবীর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য, অগ্রসরমানতা ও তাৎপর্য এখানেই। অবশ্য নাট্য-সাহিত্যের এমন ধারার শিল্পগত সাফল্যের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই। মেটারলিঙ্ক প্রমুখের (ব্লু বার্ড, মান্নাভান্না) নিরীক্ষাগত সাফল্যই এই মূলত শিল্পসত্তাময় বিজয়ী আঙ্গিকের উৎস। রবীন্দ্রনাথ সেই সূত্র ধরেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও শিল্পের আধিপত্য-সম্ভাবনার দিগন্ত খুলেছিলেন রক্তকরবী এবং আরো কয়েকটি নাটকের সহায়তায়।

বাংলা নাটক অবশ্য বিমূর্তকরণ এবং কালোত্তীর্ণ ব্যঞ্জনাধর্মিতার এই শিল্পমুখ্য পথ ধরে এগোয়নি। বরং বাংলা নাটকের প্রধান ধারা সম্পূর্ণরূপে কংক্রিট ঘটনাবশ—ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়-নির্ভর। এতে শিল্পের চাইতে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ইস্যু, সীমিত লক্ষ্য এবং হাতে হাতে ফলাকাঙ্ক্ষার তাৎক্ষণিক চাহিদাই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। সন্দেহ নেই, যুগের প্রয়োজনসাধনের তাকিদেই বাংলা নাটককে উদ্বাহু হয়ে এই আপাতমোক্ষের পথে ছুটতে হয়েছে। বিষয়ের ওপর শিল্পের প্রাধান্য অর্জনের এই অভাবে পরিণামে লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলা নাটকে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কালসীমা পেরোনো ব্যাপকতা বা দ্যোতনা নেই, সামাজিক উপকরণ ও মহাকালের মূল্যমানে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ এ থেকে বঞ্চিত, বস্তুত যা সফল সৃষ্টির মৌলিক গুণ। এর ফল হয়েছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের দু'একটা কীর্তি বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্যে এমন নাটক একেবারেই দুর্লভ যা পুরোনো হয় না, যা বারবার বিভিন্ন যুগে অভিনীত বা পঠিত হলেও সংবেদনশীল মনে অর্থময় ও অবিনাশী মূল্যবোধের শিহরণ জাগাতে পারে, নব পরিগৃহীত সংজ্ঞায় এ বিবর্তিত তৃষ্ণায় ও গ্রহণে সঞ্চারিত হতে পারে।

পক্ষান্তরে, সাইদ আহমদ লিখিত 'কালবেলা' ও 'মাইলপোষ্ট' শিরোনামের দুটো নাটকে সম্প্রতি শিল্পমুখ্য প্রবর্তনারই পরীক্ষণ লক্ষ্য করা গেল। বাংলা নাটকে কয়েক যুগ পরে শিল্পনিরীক্ষামূলক অবহিতির এই নবতর উদ্যম গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ, সাহিত্য-অভিব্যক্তির মহাকালের বিষয়ে পরিণত হওয়ার এই অনন্যপন্থা অন্তত বাংলা নাটকে বরাবরই অনবহিত থেকে গেছে। এ-ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিক্রমী হলেও তাৎপর্যপূর্ণ।

কেননা, মূলত শিল্পপ্রাণতাই কেবল যে-কোনো সাহিত্য-উদ্যমকে চিরস্থায়ী করতে পারে। আদতে মহৎ ও অভিলাষী সৃষ্টি মাত্রেরই এ একান্ত লক্ষ্যও বটে।

তবে রবীন্দ্রনাথ এবং এই নতুনতর প্রয়াসের শিল্পপ্রকরণগত দিক একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের শিল্পসার্থক নাটক স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন কল্পনাশ্রয়ে বাস্তবতার আভাসে ব্যঞ্জনাধর্মী বক্তব্যে গড়ে উঠেছে। আর সাম্প্রতিক উদ্যমের ক্ষেত্রে প্রকরণের পট সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এর প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য কল্পনার স্বেচ্ছাভিসারে প্রক্ষেপিত দ্যোতনায় নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত,—বাস্তবতাকে স্বেচ্ছায়ত্ত করাতে। এ প্রকরণ কংক্রিট ঘটনাবশ নয়, বরং বিমূর্ত, বিচূর্ণ এবং স্বেচ্ছাধীনে সমাবেশযোগ্য। এও ইংগিতময়তায় স্বপ্রকাশ, তবে কল্পনার প্রতিফলনের মত কার্যকারণসূত্র নিরপেক্ষ ধারণার প্রক্ষেপসর্বস্ব নয়, বরং অনিবার্য সংঘটনপরম্পরার প্রতি-রূপ, প্রতিভূ এবং ফলশ্রুতিরূপে বাঙ্ময়। স্বভাবতই এদের জাত আলাদা এবং উৎসও সম্পূর্ণ ভিন্ন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান শিল্পগত সাফল্য কল্পনার (Imagination) স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায়। বিংশ শতাব্দীর প্রধান শিল্পগত সাফল্য বাস্তব উপকরণকে স্বেচ্ছামতো ভেঙে শিল্পবস্তুরূপে ব্যবহারযোগ্য করার অবলীলা। একে বাস্তবতার ওপর শিল্পের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা বলা যায়। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যপ্রয়াসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের নিদর্শনও এ পর্যায়েই। সাহিত্যপ্রকরণের প্রগতি ও বিবর্তনের মূল লক্ষণ উনবিংশ শতাব্দীতে কল্পনার মুক্তি এবং বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবতার মুক্তির মধ্যে পরিগৃহীত হয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে কল্পনার মুক্তি যে পরিমাণ অবিনশ্বর সাহিত্য-ফসলের সম্ভার বাড়িয়েছে, বাস্তবতার মুক্তির অবদান তুলনাগতভাবে তেমন নয়। এ তথ্য হতাশাজনক নাও হতে পারে, কেননা বাস্তবতাকে ব্যাপকতম সংবেদনশীল করে ব্যবহারের এবং শিল্পীর স্বাধীন উদ্ভাবনা ও আবেগের উপকরণে পরিণত করার এই উদ্যম বেশী দিনের নয়। এখন পর্যন্ত এ সম্ভাবনার গণ্ডী পেরোয়নি।

জন অসবর্ণের Look Back in Anger এবং The Entertainer, জ্যাঁ এ্যানুই-এর Ring Round the Moon এবং Lady without Burning, Ionesco-র Rhinoceros, স্যামুয়েল বেকেটের Waiting for Gabot, End Game, Krapp's Lact Tape এবং Happy Days; জ্যাঁ কঁকত-র Human Voice এবং Opium প্রভৃতি এবং পরবর্তী সময়ে আর্নল্ড

ওয়েসকার, সেহলাগ ভেলামী, জন হুইটিং প্রমুখের নাটকের মাধ্যমেই আমরা আলোচ্য নব-পরীক্ষার পরিচয় পাই। এ সম্পর্কে অভিযোগ যে, এতে চিরাচরিত অর্থে গল্প বা প্লটের অস্তিত্ব নেই, যে-কোন জায়গায় যবনিকা-পতন ঘটলেও এদের অঙ্গহানি হয় না, এগুলো একই সঙ্গে সাহিত্য নয়, এতে হঠাৎ দৃশ্য বা চিত্র বা উল্লেখের আবির্ভাব—সঙ্গতিহীন এবং একঘেয়ে। প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে বিচারের চেষ্টা চললে অবশ্যই রস গ্রহণে উপরোক্ত বিপত্তি ঘটারই কথা। এই আন্দোলনে নাটক রচনার প্রকরণ, আঙ্গিক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। মানবীয় মননশীলতার ক্রমান্বিত উৎকর্ষ এবং উপলব্ধি ও গ্রহণ ক্ষমতার বৈপ্লবিক সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতেই সৃষ্টিপ্রয়াসের এই বর্তমান পরিকর্ষণ। বিশেষ করে বাস্তবতার বহুধা চরিত্রের সঙ্গে মানব-মনের বিচিত্র বহুমুখী গঠনমুখিতার এবং যোগাযোগে পরিগৃহীত স্ট্রীম অব কনশাসনেস, সুররিয়ালিজম এবং মাল্টিপারসপেকটিভ সম্পর্কিত চেতনা মনে রাখলে সাহিত্য প্রগতির অধুনাতম পরীক্ষাসমূহ চিরাচরিত ও প্রচলিত মানদণ্ডের অধীনে রাখার চেষ্টাকে কেবল বদ্ধমূলকতা বলেই মনে হবে না, প্রগতিবিরোধী বলেও ঠেকবে। সুতরাং বলা চলে উপরোক্ত অভিযোগমূলক মনোভঙ্গী যুগের সঙ্গে তাল রেখে এগোয়নি। প্রাচীনতর বদ্ধমূল রস-বোধে তা নিয়ন্ত্রিত। অথচ শিল্প-সাহিত্যের রসবেত্তাকে গোঁড়া এবং বদ্ধমূল হলে চলে না, তাঁকে সঞ্চরণশীল হতেই হয়, এমন সঞ্চরণশীল রসানুভূতি তাঁর পক্ষে অপরিহার্য যা পেছনে এবং সম্মুখে সমানভাবে সহজেই গতিময় হতে পারে। এই ধরনের মানসিকতা সাহিত্য বিচারে যে বিপত্তির সৃষ্টি করে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত Oskar Walzel-এর Principles of Art History—যে গ্রন্থে তিনি শেকস্পীয়রের উপর 'Wolfflin' সমালোচনা-মানদণ্ড প্রয়োগ করে তাঁকে Baraque শ্রেণীর সাহিত্য স্রষ্টা বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, তাঁকে রেনেসাঁর শিল্পচেতনার রূপকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাননি। এ বিচারে তাঁর হাতে একমাত্র প্রচলিত অস্ত্র ছিল এই যে, রেনেসাঁর নাটক কেন্দ্রীয় চরিত্র ও ঘটনাকে আবর্তিত করে গড়ে উঠে, শেকসপীয়রে তা নেই। (The number of minor characters, their unsymmetrical grouping, the varying emphasis on different acts of the play: all these characteristics are supposed to show that Shakespear's technique is the same as that of Baraque art, while Corneille and Racine, who composed

their tragedies around one central figure and distributed the emphasis among the acts according to a traditional Aristotelian pattern, are assigned to the Renaissance type. In a little book, Wechselseitige Erhellimg der Kuinste, and in many later writings, Walzel tried to elaborate and justify this transfer, at first rather modestly and then with increasingly extravagant claims. ---Theory of Literature : Rene Wellek and Austin Warren : Chapter Eleven). বস্তুত একদা পরিগৃহীত সংজ্ঞায় যাঁরা সাহিত্যকে চিরকাল ধরে রাখতে চেয়েছেন তাঁরা পরিণামে ঠকেছেন। সাহিত্যরসিক হতে গিয়ে পথের বাধাই হতে হয়েছে তাঁদেরকে অবশেষে।

এই ধরনের নাটকের বৈশিষ্ট্যবিধানে অবশ্য বলা হয় যে, এসবের ক্ষমতা 'lies in the free play of an unanchored imagination and in a mating of words and ideas which at times Shakespearean in suggestion'—কথাটা স্বাধীনতা ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সত্য। কিন্তু আদতে উক্ত নাটকসমূহে স্বাধীনতার ব্যবহার কল্পনার ক্ষেত্রে নয়, বরং বহুবিচিত্র বাস্তবতাকে অন্তরসংলগ্নতার সূত্রে যথেচ্ছ ও যথা প্রয়োজনীয় সংস্থাপনার মধ্যে, এক আপাতবিস্রস্ত অথচ এক গূঢ় অন্তর্লীন অর্থময়তার ঐক্যে সজ্জিত করার মধ্যে। শৈল্পিক আধিপত্যের প্রতিশ্রুত ফলস্বরূপ ব্যঞ্জনা ও কল্পনার প্রতিক্ষেপে গড়ে ওঠা নয়, সংলগ্ন বা সমান্তরাল উপস্থিত-অনুপস্থিত ব্যাপক ঘটনা উৎসের নির্ঘাৎ দ্বান্দ্বিক নির্যাস থেকেই এর উৎপত্তি। সময়ের অগ্রগতির সাথে এখানেই এর একাত্মতা, এখানেই এর বিবর্তনের চিহ্ন। বাহ্যিক বিচ্ছুরণকেই সর্বস্ব ধরে না নিলে এর প্রকরণ ও প্রকৃতির আবেদন শেকস্পীয়রের শিল্পসার্থকতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোন কারণ থাকে না। এদের জাত ও আবেদন আলাদা, কিন্তু সাফল্যের সূত্রটা হয়তো এক—তা হল স্বাধীনতা ও শিল্পমুখ্যতা।

তবে কথা হল, বাংলা ভাষায় এ নিরীক্ষা পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগেই গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও তাই ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা তা অনেকাংশে গ্রাস করতে পেরেছিলো, নিজস্বতায় লীন করতে পেরেছিলো। আলোচ্য নবনিরীক্ষার দাবি এখনো অতটুকু গণ্য হবার মত নয়। এই প্রক্রিয়া আপাতউপস্থাপনার চাইতে ব্যাপকতর পটভূমির

প্রতি অধিকতর অনুগত। বিশ্বঘটনার পরিণামের সাথে যোগযুক্ত, অন্তর্গূঢ় ব্যাপ্ত ও সূক্ষ্ম সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৫২ সালে Waiting for Gabot প্রকাশিত হয়। আগে থেকে শুরু হলেও এর পরেই এই পদ্ধতি এক সাহিত্যিক রীতিতে সম্ভাবী আলোড়নের সৃষ্টি করে।

এ সম্পর্কে গভীরতার পর্যালোচনার জন্যে সাইদ আহমদের নাটক 'মাইল-পোষ্ট' নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা যাক।

২

প্রথমেই নাট্যাংশের কিছু কিছু উদ্ধৃতির সহায়তা নেওয়া যাক :

চোকিদার : দুনিয়ার কথা ভাববে কে? আমি হলাম গিয়ে জন-পথের হতভাগ্য পাহারাদার।

গোরখোদক : বেশ, তা হলে জনপথের কথাই চিন্তা কর। পথের কথা কি চিন্তা করছ? আমাকে বলবে?

চৌকিদার : জনপথের ভাগ্য কামনা করছি, যেন—

গোরখোদক : যেন এর উন্নতি হয়, পরিবার-পরিজন আর বাংলো বাড়ীর সমাহারে মুখরিত হয়ে ওঠে যেন---

চৌকিদার : বাজে কথা। এ হল এমন এক জায়গা যেখানে প্রত্যেক মানুষ কিছু সময় কাটিয়ে যায়, কেউ বা পরবর্তী গন্তব্যের পথে ছুটে যায়। হতভাগ্য জনপথ---এ বাঁক-ঘোরানো ব্যাপ্তির কথা ভেবে কেউ এখানে থামার, বোঝার, চেনার কথা চিন্তা করে না।

গোরখোদক : তুমি কাউকে থামাবার চেষ্টা করেছিলে?

চৌকিদার : অত্যন্ত অর্থহীন হতো ও প্রচেষ্টা। জান, জনপথের ওপর খুব কিছু একটা করা সম্ভব নয়, এখানে তুমি ঘর বাঁধতে পার না।

গোরখোদক : এ ধরনের একটা জনপথের প্রয়োজন কি?

চৌকিদার : প্রয়োজন? আসা-যাওয়ার মধ্যে অনেক বিলম্ব করা, আর, "তোমার-আমার মত ক্ষণিকের বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।"

উপরোক্ত সংলাপের নায়ক একটি চৌকিদার এবং একটি গোরখোদক। এদের পেশাগত মনের সঙ্গে এদের আনুপাতিক চেতনা পর্যায় জড়িয়ে

দেখলে, প্রচলিত বাস্তবতাবোধের ধারায় এদের কথিত সংলাপ কখনোই যথাযোগ্য মনে হবে না। পেশানুযায়ী এদের সরল ও সাধারণ চিন্তাশক্তির লোক হওয়ার কথা। এদের ধারণাসীমা সংকীর্ণ এবং বোধের স্তর হবে ন্যূনতম, সঞ্চরণ ক্ষমতায় থাকবে খুবই অভাব—চিরাচরিত বাস্তবমুখিতার সংজ্ঞায় এই হলো এদের চারিত্রিক সম্ভাব্যতা। কিন্তু আলোচ্য নাট্য-নিরীক্ষায় ব্যক্তি সম্পর্কে নাট্যকারের দৃষ্টি এরকম নয়। বর্তমান জীবনজটলায় আশ্রিত ব্যক্তিমাত্রই তাঁর কাছে আধুনিক, এর চেতনার স্তর বহুদূরপ্রসারী এবং বহুবিচিত্র সংযোগে তা অন্তর্লীন বলেই তিনি মনে করেন। কারণ, আধুনিক পৃথিবী কোথাও আর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, আপাতআবদ্ধ নয়, একক সম্পন্নতায় বিচ্ছিন্নও নয়। এই পরিবেশ-আক্রান্ত মানুষও তাই তথাকথিত সরল এবং নিজের উপার্জনের শিকড়াবদ্ধ মাত্রই আর থাকতে পারে না। সে যা-ই করুক না কেন, তার চেতনার পল্লব বহুধাবিসৃত হতে বাধ্য, তার পেশাগত অস্তিত্বের বাইরেও সহস্রমুখ হতে অনায়াসেই পারে। অথচ সেই সঙ্গে সে আত্মসজাগও বটে—সে জানে, 'আমি হলাম গিয়ে জনপথের হতভাগ্য পাহারাদার'—কিন্তু এটা তার প্রাপ্য সুযোগের ক্ষুদ্রতাজনিত আক্ষেপমাত্র—নিজের অস্তিত্বকে সেই মাপে খাটো করার উদ্বেগ কোনক্রমেই নয়। আর তা ছাড়া এ-যুগে যে-কোন মানুষের মন—তা যে শ্রেণীরই হোক না কেন—এমন ভাবেই বেড়ে গেছে, সাবালক হয়েছে, বোধ ও বুদ্ধি পরিগ্রহ করেছে—এ-ও তো এক স্বাভাবিকতা বৈকি। যে কারণে চৌকিদার উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তার শেষ মন্তব্যে তার রুজির উৎস জনপথের পরম্পরাউর্ধ্বে উঠে এ-সম্পর্কে সহজেই অত্যন্ত আত্মস্থ কণ্ঠে ফিলোসফাইজ করতে পারে এবং গোরখোদকও চৌকিদারের পেশাগত কর্তব্যের বাইরেও মানবীয় দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলতে পারে অনায়াসেই, 'তুমি কখনও কাউকে থামাবার চেষ্টা করেছিলে?'

পৃথিবীর অগ্রসরমানতা এবং সেই তুলনায় মানুষের মননশীল বৃদ্ধি হিসেবে রাখলে গোরখোদক এবং চৌকিদারের উপরোক্ত চারিত্র্যই অধিকতর বাস্তব মনে হবে। অবশ্য এ বাস্তবতার ধারণার সঙ্গে পূর্বতন বাস্তবতার ধারণার কোনো মিল নেই। কিন্তু মানুষ ও পরিপার্শ্বের অগ্রগতির সাথে তাল রাখতে গেলে বাস্তবতার প্রতিফলনে উপরোক্ত বিবর্তিত প্রকরণ প্রক্রিয়া ও বোধের ওপর নির্ভর না করে উপায় আছে বলেও মনে হয় না।

সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' নাটকটির মত আলোচ্য 'মাইলপোষ্ট'ও একটি নিদারুণ বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কালবেলার উৎস সাইক্লোন এবং এর উৎস হল অবধারিত আসন্ন দুর্ভিক্ষ। এই দুটো গভীর প্রভাবশীল ঘটনার উৎক্ষেপে নাটকের কুশলীদের মনোভাব, প্রতিক্রিয়া, জীবন-ধারণা এবং বৃত্তিগত ও আত্মপরিগ্রহণগত ব্যক্তিত্ব ও আচরণ প্রতিফলিত হয়েছে। হয়তো এমন বলা যায় তারা ঘটনা ছাড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু এ-কথা যথার্থ হলো না। কারণ মানুষ মাত্রই যে-কোনো ঘটনার উর্ধ্বে এবং যে-ঘটনার প্রেক্ষিতে তার মুখোমুখি হয় না কেন, সেই মুহূর্তেও সেই ঘটনাসর্বস্ব সে নয়। অথচ ঘটনায় সে আবর্তিত হয় এবং এমন ঘটনার সম্মুখীনও তাকে হতে হয় যা তাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে। তবুও মানুষ বিশেষত আধুনিক মানুষ গভীর গ্রন্থনে গড়া, তার ইনডিভিজুয়ালিজম সহস্র স্মৃতি, সহস্র যোগাযোগ, সহস্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা ঘৃণা-দুঃখ মূল্যবোধ-স্খলন হতাশা এবং কখনো কখনো কার্যকরণ সম্পর্ক এবং করণীয় আদর্শ চেতনা কোনোটাই সে ভোলে না। এ সবের স্পন্দন তার অজান্তেই তার প্রতি-ফলনে রণিত হয়ে উঠতে থাকে। মাইলপোষ্টের সংলাপ প্রতিসরণের মধ্যে এই বিচ্ছুরণ ছটাই লক্ষ্য করা যায়। এর ব্যঞ্জনা জাগতিক ঘটনার প্রতি-ক্ষেপে অবধারিত সত্যরূপে কিংবা উপলব্ধ ধারণার সর্বজনীনতায় উৎসারিত। সংলাপের শুরু এবং শেষ হয়তো মূল জায়গাতে ফিরে আসেনি, এর বিন্দুকেন্দ্রিক ধারাবাহিক পরিণতিও হয়তো নেই, কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ তথ্য আর অজানা থাকেনা যে, সংলাপসমূহের আপাতবিচ্ছিন্নতা ও উল্লম্ফনের পশ্চাতে গভীর যোগাযোগ রয়েছে, বর্তমানের জীবন আলোড়ন যে কত অগোচর মোড়কেও আপন বৃত্তের মধ্যে লীন করে নিয়ে বসে আছে, তা অকস্মাৎ সংঘাতে বা দ্বান্দ্বিক আবেগে ব্যক্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে জানতেই পারা যায় না। আর এই জটিল বিপুল ব্যাপ্ত স্বরূপ আজকের আলো-হাওয়ায় বর্ধিত সব মানুষের জন্যেই হয়তো সত্য। এমন চিৎপ্রকর্ষের অধিকারী হয়তো সবাই, স্বাতন্ত্র্যসচেতন ব্যক্তি মাত্রই। এদের স্বরূপকে, এদের চৈতন্য-বিস্তৃতিকে প্রকাশ করার জন্যে সেই বাস্তবতারই অনুসরণ করা দরকার, আদতে এদের মধ্যেই যার চলচ্চিত্রের মত দ্রুত সঞ্চরণ ঘটছে, একটার জন্য অন্য জন্মকে ওষধি লালনে জায়গা করে দিচ্ছে, কোথাও আপাতসম্পূর্ণতা নেই—অজস্র খণ্ডে এক অবিশ্বাস্য অখণ্ড জীবনপ্রবাহের দিকেই ধেয়ে চলা। এই বাস্তবতা তাই গূঢ়তর

গভীরতর বাস্তবতা। যেহেতু এক সুতোয় গাঁথা নয়, শুরু আর শেষের টীকা-তিলকে সাজানো বাগান নয় এ, সেজন্যেই একে উদ্ভট বলে বসলে হয়তো পুরনো রসনা তৃপ্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে অগ্রসর ক্ষমতার স্বরূপ বোঝা যাবে না, মেজাজ বোঝা যাবেনা, গঠন প্রক্রিয়াও নয়।

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ঘটনাবলী নয়, সংলাপই এমন নাটকে অনুসৃত বাস্তবতার বাহন। এতে ব্যবহৃত জাগতিক ঘটনার বহু বিচিত্র রহস্যলীলা সম্পর্কে সজাগ ইঙ্গিত সমূহ চেতনায় শিহরণ, স্মৃতিতে স্পন্দন না এনে পারে না। মানুষের মননবৃত্তির প্রগতিসাপেক্ষে লেপামোছা ঘটনার বাস্তবতা দিয়ে তাকে হয়তো আর খুশী করা যায় না, অন্তত মহৎ উদ্বোধন ঘটানো যায় না তার মনে। সেজন্যই বাস্তবতার সামান্যতা নয় অসামান্যতার সমাবেশেই এই ধরনের সৃষ্টি উদ্বুদ্ধ। অর্থাৎ এ বাঁধা বোলে আটকে থাকতে রাজী নয়—উপাদান যতটুকু এগিয়েছে তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসী, উত্তরণ প্রয়াসী, সৃজনী ভাঙনের উচ্চাভিলাষী।

উপরোক্ত বক্তব্যের সাহায্যে আমি কোনো নাটকবিশেষের মহতীকরণ করতে চাচ্ছি নে। আলোচ্য প্রকরণের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অবহিত করাই আমার উদ্দেশ্য মাত্র।

৩

তিনটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটক 'মাইল-পোষ্ট'। সন্দেহ নেই এর গঠনে শিথিলতা রয়েছে। একগ্রীব সঞ্চালিত শিহরণ এতে নেই। এর ক্লাইমাক্স দ্বিতীয় দৃশ্যে, তৃতীয় বা শেষ দৃশ্যেও রয়েছে পরিপূরক আর একটি ক্লাইমাক্স। ইংগিতের অজস্রতা এবং বহুধাসূত্রের প্রাসঙ্গিকতার ত্বরিত সঞ্চরণ যে compactness-আনার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না 'কালবেলা' তার প্রমাণ। কিন্তু মাইলপোষ্টে সেই compactness-এর অভাব রয়েছে। যে পদ্ধতিতেই নাটক লেখা হোক না কেন, নাটকের ক্রমপ্রসারের মূলে থাকা চাই দর্শকের বা পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত রাখার উপাদান। এ হল নাটকের মৌলিক চাহিদা। 'কালবেলা' এ শর্ত মেটাতে যতটুকু সার্থক, মাইল পোষ্ট ততখানি নয় বলে মনে হয়। তাছাড়া ইংগিতের, বক্তব্যের এবং সংলাপ ধাঁচের পুনরাবৃত্তি মাইলপোষ্টের রসাস্বাদনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। বস্তুত এ ধরনের নাটকের উপভোগে শিল্প চেষ্টাই প্রধান ও

প্রখর হয়ে ওঠে বলে, এতে এয়েসথেটিক প্লেজারের হানিমূলক বিষয় একটু তীব্রভাবেই অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। কারণ, এ দর্শক বা পাঠকের সূক্ষ্মতম মনোযোগ ও জাগৃতিকে আহ্বান করে—সেই সতর্ক সজাগ উজ্জীবনে বৈচিত্র্য-পূর্ণ জীবন ও পরিপার্শ্বের ললিত স্পর্শ মাত্রই যেমন তৃপ্তিকর, এর বাহুল্য, স্থূলতা, পুনরাবৃত্তি, শিথিলতা প্রভৃতিও তেমনি অরুচিকর। সে জন্যে এই প্রকরণের ব্যবহারে স্খলন মাত্রই ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে।

মাইলপোষ্টের প্রধান ত্রুটি, এতে কৌতূহল বাঁচিয়ে রাখার উপযোগী গীতিময়তা নেই। এর সংলাপ যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন, স্মৃতি ও বোধে যতই দূরপরাহত পরিচিতি ও অবস্থিতির চাঞ্চল্য আসুক না কেন---এর বাক্যাবলী অনেকাংশেই যেন এক লীলাময় চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। কেমন যেন প্যাটার্নাইজড, উদ্ভিদ্যমান নয়, সঞ্চরণহীন। পাশ্চাত্য-পরীক্ষার সাক্ষাৎ প্রভাবে গড়ে উঠলেও 'কালবেলা'তে একটা সজীবতা ছিল---তাতে নিশ্চিত অগ্রসরমানতা ছিল এবং উপস্থিত বিষয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল সম্প্রসারিত, দর্শক বা পাঠকের মধ্যে সঞ্চালিত। ফলে নাটকটা তন্মুহূর্তিক সত্যস্বরূপ লাভ করেছিল, যা নাট্য সাফল্যের এক বিশেষ লক্ষণ। মাইলপোষ্টে এমন যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না, সঙের বারবার দর্শকদের সম্বোধন সত্ত্বেও বোধকরি এ কথা সত্য। উপরন্তু, দ্বিতীয় দৃশ্যের ক্লাইমাক্স দর্শক বা পাঠকের মনে পরবর্তী নিবিষ্টতার গোড়া অনেকটা ধসিয়ে দিয়েছে, সন্দেহ নেই।

'মাইলপোষ্ট' শিরোনাম ডঃ বেনেটের তিন পুরুষে প্রসারিত নাটক মাইল-পোষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নাটক দুটো যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, তা বলাই বাহুল্য। শিরোনামের প্রতীক-দ্যোতনায় মিল রয়েছে, এইমাত্র। মাইলপোষ্ট পরিবর্তনশীলতায় আভাসিত, এ কথা অবশ্যই বলা যায়। এতে সম্মুখগতির ইঙ্গিত বিধৃত। বিশেষত এই নাটকের দু'একটি চরিত্র মাইলপোষ্টের দিগচিহ্ন পাল্টানোর মধ্যে যে এ্যাকশন ফুটিয়ে তুলেছে, তাও প্রতীক মূল্যে সংযোজনা করেছে। কেননা, ওতে গতিময়তা ও পরিবর্তন-মুখিতায় ব্যক্তির সক্রিয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা সঞ্চারিত হয়েছে। এমন ইচ্ছা-অনিচ্ছা-মূলক সচেতনতা আধুনিক ব্যক্তির মনের এক গভীর বিশেষত্ব। সফল হোক বা না-হোক মনে মনে তা নেহাৎ-ই বিদ্যমান, অনেক ক্ষেত্রে তা বাঙ্ময়ও। অনেক ক্ষেত্রে তা আবার উদ্যমশীলও। মানুষের এই নব পরি-গৃহীত সচেতনাও ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায়ই

নিজেকে অবদমিত, লাঞ্ছিত, পরাভূত ও যোগ্য বিকাশবঞ্চিত বলে ভাবতে বাধ্য হয়। ফলে আধুনিক মানসিকতায় প্রায়ই হতাশাজনিত সিনিসিজম লক্ষ্য করা যায়। নিজের উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা যদি না বাড়ত এবং সেই প্রেক্ষিতে নিজের কর্ম ও উদ্‌ভাবনা শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে অসহায় বোধ না করত, তবে এমন ক্ষয়িষ্ণু অনুভূতির সৃষ্টি হত না। যন্ত্রযুগের এ এক অভিশাপ। সে কারণে মাইলপোষ্টের সংলাপে দায়শূন্য মন্তব্যের তীক্ষ্ণতা লক্ষণীয়, যদিও বুঝতে বাকী থাকে না এর পশ্চাতে মানবীয় দরদ ঠিকই রয়েছে। এই বাহ্যিক উগ্রতা এবং কঠোর আঘাতমূলক স্পষ্টোক্তি বা নিষ্ঠুর সত্য উদ্‌ঘাটনের পশ্চাতে যে প্রত্যাশা ও তার বিপরীত অবস্থা বৈগুণ্যের দ্বন্দ্বময় প্রতিক্রিয়া কাজ করে চলেছে, তা আন্দাজ করা শক্ত নয়। জীবনের ক্লান্তিকে বোঝার ক্ষমতা তাই আধুনিক মানুষকে পৃথিবীর আবহমানের বয়স বাড়ার উত্তরাধিকারী করে তুলেছে। আগের মত এখন আর মানুষের ষাট বা বত্রিশে মৃত্যু হয় না। ষাট এবং বত্রিশের সঙ্গে পৃথিবীর বয়সটাও যোগ হয়। তাই আধুনিক মানুষের স্বরূপের ভিত্তিটা নির্বিচারে অসামান্য। মাইলপোষ্টের চরিত্রগুলো এ কথাই প্রতিপন্ন করে। তাদের awareness তাদেরকে এক সত্যে, এক তথ্যে, একবিন্দুতে, তাই বেশীক্ষণ টিকিতে দেয় না—অবলীলায় ছড়িয়ে দেয়, আবার আবর্তমান ঘটনা উৎসের পারম্পর্যে গুছিয়ে তোলে। যেহেতু কুশীলব ও দর্শক কেউই এই ব্যাপ্ত অঙ্গনে আগন্তুক নয়, সেহেতু এমন ছড়িয়ে পড়া এবং গুছিয়ে নেয়া উভয় পক্ষের কারো জন্যেই অবান্তর, অহেতুক ও উদ্ভট হয়ে পড়ে না—তাদের চেতনা অবচেতনা অচেতনার তাৎক্ষণিক সমন্বয়ে বরং এই স্বাতিক্রমণই উভয়ত মানসিকতায় সমার্থক হয়ে ওঠে—বর্তমান মানুষের মানস উৎকর্ষের শীর্ষ চূড়াতেই এ বৈপরীত্যের রেশ তুলতে পারে স্বাভাবিক ভাবেই। আদতে এর সংবেদনশীলতার ভিত্তিটা মননশীলতার, তাই বস্তুতলগত।

মাইলপোষ্টে অবশ্য পাশ্চাত্যের এ ধরনের নাট্য-নিরীক্ষায় যে সকল অনুরণন প্রবল, তার প্রায় সব কটাই যেন ফরমূলা হিসাবে অনুসৃত হয়েছে। এ্যাবসারডিটি, নাথিংনেস, অনিশ্চয়তা এবং অলৌকিক রহস্যময়তার আকস্মিক ইঙ্গিত প্রভৃতি পাশ্চাত্যের এ ধরনের নাটকগুলোতে পাওয়া যায়। মাইল-পোষ্টেও এই পরিণামী মনোভাবসমূহ রয়েছে। অবশ্যই এ বিষয়ে স্পষ্ট থাকা দরকার যে আলোচ্য প্রকরণ ও প্রক্রিয়ার এই মনোভঙ্গী হতে অনুষঙ্গগুলো

অনিবার্য ও অবিভাজ্য নয়। ব্যঞ্জনাধর্মী বিমূর্তকরণমূলক সঞ্চারী বাস্তবতার এই প্রতিফলনে চরিত্রের কি মনোভাব তুলে ধরা হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নাট্যাকারের ওপর। বাস্তবতার এই স্বাধীন ও স্বেচ্ছায়ত্ত ব্যবহারের সাহায্যে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ফল ফলিয়ে তুলতে পারেন। এ-ক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদ স্বাধীন প্রকরণ ব্যবহারের স্বাধীনতা নিয়েও মাইলপোষ্টের চরিত্র-সমূহের মানস প্রতিফলনে পাশ্চাত্ত্যের লেখকদের হাত ধরেই পাশ্চাত্ত্যের ব্যক্তি-সঙ্কটেরই পরিণামী প্রতিফলের সঙ্গত করেছেন। এতে নাটকটির নিজস্ব উদ্ভবের বিশ্বাসযোগ্যতায় ফাটল সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়।

ইব্রাহিমের সন্তান উৎসর্গের প্রতিভাসে গড়া মাইলপোষ্টের স্বপ্নসংকেতটি যেন একথাই মূর্ত করে যে, ত্যাগ-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা উন্মাদনার সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি ত্যাগ বাস্তবে ঘটে না। সেজন্যে ফলাফল পূর্বাপর এক। ত্যাগের প্রেরণায় যে মহতী উদ্বোধন আমাদের মনে ঘটে তা কার্য-কারিতার অভাবে একেক সংক্ষোভের পর স্তরে স্তরে মিইয়ে যায়, নিষ্ফলা হয়ে পড়ে। তাই মানুষের সর্বজ্ঞ তৃতীয় নয়নের উদ্ভব হচ্ছে, যুগে যুগে তার সৃষ্টিক্ষমতা উজ্জ্বলতর হচ্ছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিকার হচ্ছে না। এই সত্য মানুষ জেনে ফেলেছে, তাই দুঃখ আরো দুর্বহ। সৈয়দ আহমদ ঐতিহ্যসম্পৃক্ত স্বপ্নসঙ্কেতে এই তাৎপর্য যেমন মৌলিক-ভাবে যুক্ত করতে পেরেছেন, অন্যত্র ততটা পারেন নি। পারলে সম্ভবত মাইলপোষ্ট নিয়ে আরো উৎসাহিত হওয়া যেত।

আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে যুগচেতনা

আধুনিক কালের উপন্যাস আর কবিতা স্বভাবে ও মেজাজে বড্ড কাছাকাছি এসে গেছে। লিরিকে এখন আর আমরা ন্যারেশন আশা করতে পারিনে, এমনকি প্যাসটোরাল বর্ণনাতেও নয়। লিরিক সবকিছুকে এখন বিমূর্ত বা এ্যাবস্ট্রাক্ট করে তুলতে চায়—রূপ বক্তব্য মানস স্বভাব সবকিছু। উপন্যাস অবশ্য বাস্তবনির্ভর সাহিত্য। বাস্তবের সঠিক অনুসরণ না করলে উপন্যাসের চারিত্র্যই গড়ে ওঠে না। কিন্তু আধুনিক উপন্যাস উপন্যাসের এই মূলগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই যেন সংঘর্ষে উপনীত। আধুনিক উপন্যাস বাস্তবকে তথাকথিত বাস্তবতার চোখে দেখতে চায় না। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ মিলিয়ে বাস্তবতার বহুমুখী পরিমণ্ডলের মধ্যে আধুনিক ঔপন্যাসিক-প্রবণতা অবাধ সঞ্চরণশীল হয়ে উঠতে চায়। সেজন্যে কবিতার মতোই বাস্তবতার বিমূর্তায়ন এর জন্যে প্রয়োজন। ঘটনাকে ভেঙেচুরে, গল্পকে তুচ্ছ করে এক স্বেচ্ছাসচল চেতনাস্রোতই এতে প্রাধান্য পায়। আধুনিক ঔপন্যাসিকের প্রবল বক্তব্য প্রকাশের জন্যে এই আঙ্গিক হয়তো এক অপরিহার্য চাহিদা হয়ে এক সময়ে দেখা দিয়েছে। ইংরেজী-সাহিত্যে এই চাহিদার সময় নির্দেশ করতে হলে জেমস জয়েসের ইউলিসিসের প্রকাশ-বছর ১৯০৩ সালকে চিহ্নিত করতে হয়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফে এই লক্ষণ গঠনমুখী ছিল। ১৯১৪ সালে হেনরী জেমস-এর উপন্যাসে এ-ধারা এক স্পষ্ট পরিণতি ও প্রবাহ লাভ করলো এবং হেনরী জেমসই উপন্যাসের এই অন্তস্রোত-নির্ভর লক্ষণের নামকরণ করলেন স্ট্রীম অব কনশাসনেস বা চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস বলে।

উপন্যাসের এই স্বেচ্ছামত্ত স্বাধীন বিকাশ আরো কিছু ধারার জন্ম দিয়েছে—এক্‌জিসটেনসিয়ালিজম বা অস্তিত্ববাদ, স্যুররিয়ালিজম বা অবচেতনাবাদ এই ধারাগুলোর অন্যতম। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার

যে, ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণই আধুনিক উপন্যাসের এই বিচিত্র, জটিল ও স্বেচ্ছাসঞ্চরণশীল বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক অর্জনের প্রধানতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে। আধুনিক উপন্যাসে তাই যুগীয় সত্যের উদ্‌ঘাটন মানব মনের বহুস্তর উদ্‌ঘাটনের মধ্যেই আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি।

এরই পাশাপাশি আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায় যা মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সমাজ চেতনাকে সমন্বিত করে গড়ে উঠেছে। এর সময়-কালও চিহ্নিত হয়ে আছে সেই ১৯০৩ সালেই, যে বছর গোর্কির মাদার উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, মার্কিন এবং রুশীয় আধুনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ দুটো ধারাই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। অবশ্য এ দুটো ধারাতেই উপন্যাস শিল্প হিসেবে যে সঙ্কটের মুখে পড়েছে, এ-সত্য খুবই স্পষ্ট। চেতনাপ্রবাহ বা অস্তিত্ববাদী বা অবচেতনবাদী ধারায় মনোবিকলনসর্বস্বতার ফলে ঘটনা মার খায়, গল্প মার খায়, বাস্তবতা মার খায়, এমনকি চরিত্রও বক্তব্যের বাহন হয়ে ওঠে মাত্র। অন্যদিকে সমাজচেতনামূলক ধারায় আদর্শবাদের যান্ত্রিকতা জীবন রূপায়ণের স্বতঃস্ফূর্ততাকে ব্যাহত করে। এই উভয় ক্ষেত্রেই তাই আমরা মধ্যপন্থী সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করি। হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দি সি', টমাসম্যানের 'ম্যাজিক মাউণ্টেন', ইলিয়া এরেনবুর্গের 'ফল অব প্যারি' প্রভৃতি গ্রন্থ বাস্তবতালীন গল্প এবং অগ্রসরমান মানব-মনের গভীর-স্বরূপ একত্রে গ্রথিত করার সমন্বয় প্রয়াস বলে উল্লেখ করা যায়।

বলা বাহুল্য আমরা আমাদের উপন্যাসের বেলাতেও এই বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উত্থান-পতন, অন্বেষা, বিচিত্র জীবনজিজ্ঞাসা, বিচিত্রতর আঙ্গিক সঙ্কট ও সমন্বয়প্রয়াস স্বাভাবিক কারণেই আশা করতে পারিনে। সময়-কালের দিক থেকে ১৯০৩ সালেই বাংলা ভাষাতেও 'চোখের বালি'র মতো মনোবিকলন ও বাস্তবতানির্ভর গল্পউপকরণের মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য-রক্ষাকারী একটি উপন্যাস বেরিয়েছিল। তারপরের ইতিহাস আর যা-ই হোক, পাশ্চাত্যের বিপুল উপন্যাস ঐশ্বর্যের বিকাশধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত নজীবর রহমানের 'আনোয়ারা' গ্রন্থটি আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম ফসল হিসেবে বিবেচনা করেই আমাদের যাত্রা শুরু। এটা আমাদের তদানীন্তন বদ্ধমূল ও পশ্চাদপদ মধ্যবিত্ত মুসলিম জীবনেরই একটি যুগীয় একনিষ্ঠ চিত্র। এতে যুগ-আলেখ্য আছে। কিন্তু যুগচেতনা বলতে যা বোঝায়, তা অনুপস্থিত।

এতে লেখকের মনোভাবও নিতান্ত উচ্চাশানিরপেক্ষ ও উদ্বেজনারহিত। এ ধারা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

তারপর হঠাৎ ১৯৬০ সালের কাছাকাছি এসে আমরা কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হতে দেখলাম। যার সঙ্গে বিশ্বের আধুনিকতম উপন্যাস বিবর্তনের কিছু কিছু যোগ রয়েছে বলে আভাস পাওয়া গেল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে প্রথম স্যুররিয়ালিষ্টিক গ্রন্থ। আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' ও 'শীতের শেষ রাত ও বসন্তের প্রথম দিন', 'কর্ণফুলী' ও 'ক্ষুধা ও আশা'য় উল্লিখিত চেতনানির্ভর ও সমাজনির্ভর দুটো ধারারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' ও 'প্রসন্ন পাষাণ'-এ রয়েছে যুগের আবহাওয়ায় গঠিত কিশোর-কিশোরীর আত্মগঠনের চিত্র। মনের গভীর ও বাস্তবতার গভীর এতে একইসঙ্গে প্রতিফলিত। শহীদুল্লাহ্ কায়সারের 'সংশপ্তক' একটি গঠনমুখী সময়ের গূঢ়গ্রন্থি মোচনেরই কাহিনী। হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ'-এ যেমন রয়েছে ক্লান্ত একঘেয়ে জীবনের জিজ্ঞাসা, তেমনি আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এ রয়েছে ভাঙ্গনমুখী অথচ গঠনপিপাসু গ্রাম-জীবনের আর্তি।

আমাদের অনুবাদ সাহিত্য

১

প্রবন্ধ

অনেক অনেক দিন আগে, যাকে আমরা বলি প্রাচীন কাল, সে সময়ে প্রবন্ধও লেখা হতো ছন্দে। কিন্তু আজকাল প্রবন্ধ বলতে আমরা শুধু বুঝি চিন্তাশীল গদ্য রচনা। তত্ত্ব এবং তথ্য নিয়ে এর কারবার। কল্পনাশ্রয়ী প্রবন্ধও রচিত হতে পারে বটে তবে সে ধরনের প্রবন্ধের সঙ্গে কোনো না কোনো বিশেষণ জুড়ে দেয়া হয়। শুধু প্রবন্ধের নামে এ-সবের পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বিশেষণ-সম্বলিত কল্পনাশ্রয়ী প্রবন্ধ-গুলোকে আমরা বলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, কিংবা রম্যরচনা, কিংবা ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনা। এমার্সন এডিসন হাক্সলী ক্যামু প্রমুখের চিন্তামূলক গদ্য-রচনাগুলোকে তত্ত্ব এবং তথ্যকেন্দ্রিক প্রবন্ধের বিভাগে ফেলতে পারি, ষ্টিল এবং ল্যাম্ব প্রমুখের প্রবন্ধগুলোকে অনায়াসে বলা যায় রম্য বিভাগের রচনা।

প্রবন্ধের আকার সীমিত এবং এর স্বভাবও কতকটা ছোট গল্পের মতো ---লক্ষ্য এবং বক্তব্য থাকে নির্দিষ্ট। কিন্তু তাই বলে প্রবন্ধের বিষয়ও সীমিত হবে এবং এর 'আঙ্গিকও নির্দিষ্ট হবে, তেমন কোনো কথা নেই। প্রবন্ধ প্রয়োজনানুযায়ী গুরুগম্ভীর চেহারা ধারণ করে, আবার দরকার হলে যেমন এর হাল্‌কা হতেও বাধা নেই তেমনি একটি বিশেষ বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে এর আকার বিরাট পুস্তকের মতো বড় হয়েও যেতে পারে। অন্যদিকে এর বিষয়েরও কোনো বাছ-বিচার নেই----দর্শন, গণিত, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা থেকে শুরু করে সংখ্যাতত্ত্ব, কী মনোবিকলন—জাগতিক সকল বিষয়ের ওপরেই প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। বিশেষ করে আমরা যখন প্রবন্ধ সাহিত্যের শিরোনামায় আলোচনা করতে যাই, তখন প্রবন্ধের এই অধিকার সীমার বিস্তৃতিকে স্বীকার না করে উপায় থাকে না। সাধারণ-

ভাবে আমরা প্রবন্ধ বলতে খণ্ড খণ্ড গদ্য রচনাকে বুঝলেও, প্রবন্ধ সাহিত্যের আওতায় ভারী আকারের গবেষণা পুস্তক পড়ে, সমাজবিজ্ঞানের মোটা মোটা বইগুলো পড়ে—মোট কথা চিন্তামূলক ধারাবাহিক কাজগুলোর স্থান নির্দেশও প্রবন্ধের ভাগেই এসে যায়। আমাদের সাহিত্যে অনূদিত প্রবন্ধ সম্পর্কে এ আলোচনার বেলাতেও আমরা বিভিন্ন ধরন, আকার ও মেজাজের প্রবন্ধ অনুবাদ সামনে রেখেই অগ্রসর হব।

ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদই আমাদের মনোযোগ সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করতে পেরেছে। স্বাধীনতার আগে এবং পরে সমান উৎসাহের সংগে এ ধরনের বইয়ের অনুবাদ আমাদের সাহিত্যের অঙ্গবৃদ্ধি করে চলেছে। মিশরীয় পণ্ডিত হোসাইনীর হজরত ওসমানের উপর লেখা আরবীগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন আবদুল জলীল। শিবলী নোমানীর আল-ফারুক-এর বাংলা রূপান্তর করেছেন মৌলানা মহিউদ্দিন। ধর্ম বিষয়ে অজস্র গ্রন্থের অনুবাদ রয়েছে। ইব্‌নে খলদুন, ইব্‌নে রশিদ, ইব্‌নে সিনা প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিম মনীষীদের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ আরব সভ্যতার এক চূড়ান্ত উন্নতির পরিচয় জানার সুযোগ আমাদের কাছে সহজ করে দিয়েছে। হিট্টির 'হিষ্ট্রি অব দি আরবস্', এবং আমীর আলীর 'হিষ্ট্রি অব দি সেরাসিনস'-এর বাংলা তর্জমা আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখায় মূল্যবান সংযোজন বলতে হবে। কাব্যে এবং কাব্যসম্পর্কিত আঙ্গিকগত চিন্তায় আরবরা কয়েকশত বছর আগেও কতদূর অগ্রসর ছিল, ইব্‌নে খলদুনের 'আরবী কাব্যতত্ত্ব' গ্রন্থটি সে সম্পর্কে এক শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। নূর মোহাম্মদ মিয়া অনূদিত ইব্‌নে খলদুনের 'মোকাদ্দিমা' —এই আরব মনীষীর সমাজবিষয়ক চিন্তার বাংলা রূপ আমাদের যে শুধু-মাত্র ব্যাপকভাবে আরবদের সামাজিক উৎকর্ষ সম্পর্কে অবহিত করে তাই নয়, সে সময়ে আরব মনীষীদের সমাজচিন্তা যে কতদূর এগিয়ে গিয়েছিল তা জানতে পেরে আমরা বিস্মিতও খুব কম হই না। এই চিন্তাধারার এক শ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আল বেরুণীর 'ভারত তত্ত্বে'। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন ডঃ এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ।

ধর্ম এবং আরবী ভাষার প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থরাজি অনুবাদের পাশাপাশি আরেকটি প্রাচীন সভ্যতার মননশীল অবদানের প্রতিও আমাদের সাহিত্যিক-দের দৃষ্টি আগ্রহের সঙ্গে আকর্ষিত হয়েছে। এ দিকটা হলো গ্রীক মননশীল সাহিত্যের অনুবাদ। এ পর্যায়ে এরোস্টটলের 'পলিটিকস্' অনুবাদ

করেছেন নূর মোহাম্মদ মিয়া, প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম' অনুবাদ করেছেন ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। এরোস্টটলের 'পোয়েটিকস'-এর বাংলা তর্জমা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর হাতে শিল্পসম্মত রূপ পেয়েছে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী হাউসম্যানের 'ন্যাচার এ্যাণ্ড নেম অব পোয়েট্রি' গ্রন্থটিরও অনুবাদ করেছেন 'কাব্যের স্বভাব' নামে। তাঁর এ অনুবাদও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। হাণ্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস'-এর বাংলা ভাষান্তর করেছেন আবদুল মওদুদ। সরদার ফজলুল করিম ডব্লিউ. সি. স্মিথের 'ইসলাম ইন্ মডার্ণ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থটিরও বাংলা অনুবাদ করেছেন 'পাক-ভারত উপ-মহাদেশে মুসলিম পুনর্জাগরণের পটভূমি' নাম দিয়ে। এই তর্জমাটি এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে পূবালী পত্রিকায় খণ্ড খণ্ডভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অনূদিত এম. এন. রায়ের 'প্রকৃত ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' গ্রন্থটিও এই সঙ্গে স্মরণযোগ্য। ধর্মসংক্রান্ত অপর দুটো অনূদিত বইয়ের উল্লেখ এখানে না করাটা খুবই ভুল হবে বলে মনে করি। বই দুটো হলো 'জরথুস্ত্র বললেন' এবং 'কনফুসির ধর্মচিন্তা' বিষয়ক বই।

ইকবালের 'রিকন্‌ষ্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থটস'-এর বাংলা তর্জমা হলো 'ইসলামে ধর্মীয় পুনর্গঠন'। আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রমুখ এই গ্রন্থ অনুবাদে অংশ নিয়েছেন। 'কালচারাল হেরিটেজ অব পাকিস্তান'-এর বাংলা অনুবাদ হলো 'পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার'। এ বই অনুবাদেও আমাদের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।

বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান পাবলিকেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সুপরিকল্পিত-ভাবে বিদেশী ভাষার মননশীল সাহিত্য অনুবাদে ধারাবাহিক ভাবে নিয়োজিত রয়েছেন। এদের প্রচেষ্টার ফল আমাদের অনূদিত প্রবন্ধ সাহিত্য নিঃসন্দেহে লাভবান করে তুলেছে।

২

কবিতা

সাহিত্যের ঝোঁক মৌলিক রচনার দিকে। যিনি কবি হতে চান তিনি মৌলিক কবিই হতে চান। মৌলিক কবি হতে না পারলে, অনুবাদ করে হলেও কবি নাম জাগিয়ে রাখতে অনেকেই আদা-জল-নুন খেয়ে

লেগে থাকতে পারেন, কিন্তু তাতে কবিস্বীকৃতি মেলে না। এতো জানা কথা। কবিতার অনুবাদকও মনে মনে সে-কথা নিশ্চয় জানেন। সে-কারণেই বোধকরি অভিধানে কবি শব্দটাও আছে, অনুবাদক শব্দটাও আছে, কিন্তু দুয়ে মিলে 'অনুবাদক-কবি'—এই যুগ্ম শব্দটা জায়গা করে নিতে পারলো না কখনো, যদিও এমনটা হলে কবি নন এমন অনেক কবিতার অনুবাদক কবি-স্বীকৃতির কিছুটা ভাগ পেয়ে মনে মনে খুবই খুশী হয়ে উঠতেন, সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাতেই বা কি। মৌলিক কবি ও কবিতার দাম যত বেশীই হোক, অনুবাদ কবিতা কিন্তু সাহিত্যের আসরে বেশ খানিকটা মোটা জায়গা দখল করে থাকে। এর কদরও কম হয় না এবং যাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুপম কাব্যের অনুবাদ করে থাকেন, তাঁরাও সবার কৃতজ্ঞতাভাজন হন, প্রশংসাধন্য হন। তাছাড়া এমনও দেখা গেছে, যখন কোনো দেশের সাহিত্যের বেলায় মৌলিক রচনার ভাঁটা কাল চলে, তখন অনুবাদের একটু অধিকতর মাত্রার তোড়জোড়ই সেই সাহিত্যের ফাঁকা অঙ্গন সাময়িকভাবে ভরিয়ে তোলে, সেই সাহিত্য বাঁচিয়ে রাখে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নবীন বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল অনুবাদ সাহিত্য দিয়েই। পৃথিবীর সকল সাহিত্যের বেলাতেই কী সুসময়ে কী দুঃসময়ে অনুবাদ রচনা সর্বদাই একটি অতীব প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এসেছে। তাই এ-কথা প্রবাদ বাক্যের মতো আউড়িয়ে বলা চলে যে, মৌলিক রচনার মুমূর্ষু কাল অনুবাদ-রচনা সাহিত্যের নাভিশ্বাস ঠেকানোর জন্যে এক পরম প্রচেষ্টা ও বিধান, আর মৌলিক রচনার ভরাযৌবনে অনুবাদ-রচনা হলো একটি বর্ধিষ্ণু সাহিত্যের পতপতে বিজয় নিশান।

এ-কারণেই দেখা যায়, অনেক মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন লেখকও অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হন। অনুবাদের অন্যান্য দিক বাদ দিয়ে কেবল কবিতা অনুবাদের বেলাতেই বলা যায়, বাংলা-ভাষার প্রায় প্রতিটি শ্রেষ্ঠ কবিই কিছু না কিছু কাব্য-অনুবাদ করেছেন। এ সম্বন্ধে দীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়ার সুযোগ এখন নয়। আমি শুধু আমাদের দেশে এ কয় বছরে যে সকল ভিন্ন ভাষার কবিতা বাংলায় অনূদিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করব।

ইতিমধ্যে আমাদের এখানে অনুবাদ-কাব্যের আয়তন যা গড়ে উঠেছে, তা নিতান্ত তুচ্ছ করার মত নয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষায় কবিতা

যেমন আমাদের ভাষায় অনূদিত হচ্ছে, তেমনি বিচিত্র ধরন ও ধারার কবিতাও অনুবাদকরা বাছাই করে থাকেন লক্ষ্য করা যায়। আবার সময়ের দিক থেকেও সেই হোমারের ইলিয়াড-ওডেসী, ফেরদৌসীর শাহ্নামা থেকে শুরু করে অতি আধুনিক বীট কবিদের সাম্প্রতিকতম কবিতাও অনূদিত হয়েছে, বিশ্বের প্রধান প্রধান কবিরা তো রয়েছেনই। এতেই বোঝা যায়, আমাদের অনুবাদ-কবিতা কেবল উদ্যম ও উৎসাহেই সজীব ও তৎপর নয়, এর গ্রহণের পরিধিও অত্যন্ত বিস্তৃত।

তাছাড়া উর্দু ভাষারও বিভিন্ন কবির কবিতা এখানে অনূদিত হয়ে চলেছে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সুপরিকল্পিতভাবে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আগ্রহভরে অনুবাদ করছেন। ফর্‌রুখ আহমদ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইক্‌বালের কবিতার বাংলা তর্জমা করেছেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ-ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন। 'ইকবাল শিরোনামায়' পর্যালোচনা-সম্বলিত একটি গ্রন্থে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ইকবালের কবিতার কিছু অংশ সন্নিবেশিত করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ফরাসী কবিতার অনুবাদ করেছেন, 'দিওয়ানী হাফিজ'-- তাঁর এ-ধরনের একটি গ্রন্থ। ফর্‌রুখ আহমদের ইকবালের কাব্য-অনুবাদ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের বেশ কয়েকটা কবিতার সুন্দর অনুবাদ করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত।

রুমীর মসনভীর অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছেন মনিরুদ্দীন ইউসুফ। সিকান্দার আবু জাফর ওমর খাইয়ামের রুবাইয়াৎগুচ্ছ অনুবাদ করেছেন। আরও দু'খানা রুবাইয়াৎ অনুবাদ গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় দফা রুবাইয়াৎ অনুবাদের ঝুঁকি নিয়ে সিকান্দার আবু জাফর এ-ক্ষেত্রে তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগী এবং অনুবাদ-বৈশিষ্ট্যই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আরবী ভাষার কবিদের মধ্যে ইমরুল কায়েস এখনো আমাদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু কবি আবদুস সাত্তার গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর থেকে ধারাবাহিকভাবে পুরনো থেকে নতুন পর্যন্ত আরবী ভাষার কবিদের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। ফলে নাসিফ আল-ইয়াজেজী, ওমর আবু রাশা, আহমদ জাকী, আবু সাদী, মাহবুবা প্রমুখ আধুনিক আরবী ভাষার কবির নাম আমরা জানতে পারছি। আবদুস সাত্তার 'আরবী কবিতা' নামে একটি অনুবাদ কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ

করেছেন। আহসান হাবাবের খলিল জীবরানের আল-মোস্তফার অনুবাদ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে তা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ফরাসী কবিতাও এখানে কিছু কিছু অনূদিত হয়েছে। মালার্মে, বোদেলেয়ার, আরাগঁ এলুয়ারের গুটিকয় কবিতা এর মধ্যে পড়ে। ঠিক এমনি যৎসামান্য অনুবাদ হয়েছে রাশিয়ান ও চীনা কবিতার। পুশকিন, আলেকজাণ্ডার ব্লক, মায়াকোভস্কির কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে অনূদিত হতে দেখেছি। সানাউল হক অনূদিত বরিস পাস্তারনেকের কবিতাই কেবল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান ও সৈয়দ আলী আশরাফ যুগ্মভাবে ফরাসী কবি ইভান গলের কাব্য-অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

সবচেয়ে বেশী অনুবাদ অবশ্য ইংরাজী ও আমেরিকান কবিতার বেলাতেই ঘটেছে। এটা স্বাভাবিক, কেননা ঐ ভাষাটা আমরা বেশী জানি। ফলে ছাড়া ছাড়া ভাবে বহুজন ইংরাজী ও আমেরিকান কবিতার বাংলা তর্জমা অহবহ করে চলেছেন। এতে শেকস্‌পীয়র আছেন, এলিয়ট আছেন, এজরা পাউণ্ড আছেন। অডেন লুইস, স্পেণ্ডারসহ আরো অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবি রয়েছেন। ওদিকে মার্কিনী কবিদের মধ্যে রবার্ট ফ্রস্টের কাব্যের কিছু অনুবাদ করেছেন শামসুর রাহ্‌মান—'রবার্ট ফ্রস্ট' নামে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান অনূদিত ওয়ালট হুইটম্যানের কবিতাগুচ্ছও প্রকাশিত হয়েছে। আর তরুণতম মার্কিনী বীট কবি এ্যালান গ্রিন্সবার্গ, করসো, ফার্লিং হেটি উৎসাহী অনুবাদক হলেন আমাদের তরুণতর কবিরা। এ-সবই আমাদের সাহিত্যের অঙ্গবৃদ্ধি করছে এবং বৈচিত্র্য বাড়াচেছ। আমাদের অনুবাদকাব্য সম্পর্কে একটি বিশেষ সুখের কথা যে, এই অনুবাদ কাজগুলো প্রধানত আমাদের কবিবাই করে থাকেন। ফলে কাব্য-অনুবাদ কবিতার মেজাজ থেকে সরে যায় না, নিছক অনুবাদকের কাছে এতটুকু আশা করা যায় না। বলতে পারা যায় এটা আমাদের উপরি পাওয়া।

উদ্দীপনামূলক কবিতা

আমাদের কাব্যসাহিত্যে কখনো যে রণদামামার আওয়াজ শোনা যায়নি এমন নয়। কায়কোবাদ মহাকায় 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য লিখেছেন সর্বনাশা তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের সর্বক্ষয়ী ধ্বংস ফুটিয়ে তুলতে। সেখানে রণহুঙ্কার রয়েছে, অস্ত্রঝঞ্ঝনাও বেজেছে অকাতরে। জাতীয় উদ্দীপনার স্রোতও ফল্গু-ধারার মতো জড়ানো সেই বিশাল গ্রন্থের আদিঅন্ত কলেবরে। আর 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর মতো কাব্যগ্রন্থেও যুদ্ধবর্ণনার ছড়াছড়ি কিছু কম নেই, জাতীয় উদ্দীপনার শাণিত বাক্যবন্যাও সেখানে কোনোক্রমেই কৃপণ স্রোতে বয়ে গেছে বলা যায় না। বরং তা শৌর্যের উদ্দীপনার ঘনঘটায় ঘনঘোর হয়ে উঠেছে প্লাবিত প্রাচুর্যে :

নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল
ভীম রবে দিগঙ্গন
ঝাঁপাইয়া ঘন ঘন,
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।
ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল ধরে
দ্বিজ কোষাকষি করে
দাঁড়াইয়া বজ্রাহত পথিক যেমন।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গনি
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে
চাহিল আকাশ পানে
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।
পাখিগণ সশঙ্কিত করি কলরব,
পশিল কুলায়ে ডরে,

গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁপাল নীরব।

এই সঙ্গে মোহনলালের সেই ওজস্বী বক্তৃতা যেখানে ফের ফের ফের বলে পলায়নপর নবাব সৈন্যদের পুনরায় ইংরেজের মুখোমুখি হতে প্রাণপাত তাড়না করছেন, সেই উদ্দীপ্ত স্তবকগুলোও অনেকেরই মনে পড়বার কথা। 'মহাশ্মশান' আর 'পলাশীর যুদ্ধ' বাদ দিয়ে খুঁজলেও এমন আরো মিলবে। তবে কথা এই যে, 'মহাশ্মশান-এর' ইব্রাহিম কাদ্রী আর 'পলাশীর যুদ্ধ-এর' ক্লাইভ, মীরজাফর, মোহনলাল সবাই কবির অভিজ্ঞতার বাইরের মানুষ, এ-সবের পরিবেশ ও ঘটনাসংক্ষোভও হাতড়িয়ে সাজানো। আর এতে যুদ্ধের তুঙ্গ আবহ সৃষ্টি করতে ঘর্মাক্ত সম্মুখসমরের মেদিনীকম্পন ততখানি প্রধান নয়, যতখানি কামানের গর্জন শুনে কামিনী-কাঁখের ভরা কলসীর পানি উছলে পড়া, কি সশঙ্কিত পাখীদের কুলায়ে ভীতসচকিত আশ্রয় খোঁজা, কি 'গাভীগণ ছুটে রড়ে, বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁপাল নীরব' প্রভৃতি ঘটনাবলী। আর এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কেমন? না, তারা বিনামেঘে বজ্রাঘাতে চমকিত। যুদ্ধ তাদের স্পর্শও করেনি, এ-ব্যাপারে সচেতন কিংবা উদ্বুদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা।

এর মানুষগুলো যেমন না-চেনা না-দেখা, এর দুন্দুভি আওয়াজও তেমনি না-শোনা আনাড়ি প্রতিধ্বনি তোলামাত্র, সমরসংক্রান্ত চিত্রাবলী ও কষ্টকল্পনার প্রতিলিপি বৈ নয়। এর স্বাভাবিকতা অনেক ক্ষেত্রেই যেন সোনাভা'ন আর হযরত আলীর সেই পুঁথি-খ্যাত লড়াইয়ের গোত্রের, যেখানে তাঁরা কোথা থেকে কী করে মুখোমুখি হয়ে তেরো রাত তেরোদিন ধরে এক নাগাড়ে একে অপরের কেল্লাফতে করেও এক বিন্দু হয়রান হন না, শক্ত মাটি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আঁধার ঘনিয়ে উঠলেও তাঁরা চোখে আঁধার দেখেন না--একজন বটগাছ উপড়িয়ে তেড়ে এলেন তো আরেকজন পাহাড় উঠিয়ে আনেন এবং তা ক্রমাগত চলতেই থাকে এবং এর ফলে এতে এমন বর্ণনাও পুঁথির নামে অকাট্য ও কীর্তিত হতে পেরেছে যে,

লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার
শুমার করিয়া দেখে পঞ্চাশ হাজার।

বা,

ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল,
কিছু দূর গিয়া মর্দ রওয়ানা হইল।

এতে সবই আছে—মর্দ, ঘোড়া, লাখ লাখ সৈন্যের কাতার ইত্যাদি উত্তেজনাকর সবই। তবে লাখ লাখ সৈন্য মরলে পঞ্চাশ হাজার হয়ে যায়, ঘোড়ায় চড়েও মর্দ হেঁটে যায়, কিছু দূর গিয়ে তবে রওয়ানা হয়—এই সব হেরফের, হিসেবের গোলমাল একটু রয়েছে এই যা। আর তাই এ-সব রচনা আমাদের জাতীয়-উদ্দীপনার লক্ষ্য ও উৎস কিনা, তা খতিয়ে কেউ হয়তো দেখতে চাননি স্বভাবতই, যেমন আলী-সোনাভানের সাক্ষাৎকারের ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসার দরকার হয় না এবং কার্যত এর বাস্তবতার বিচারপ্রসঙ্গের অহেতুকতাও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে নিজেনিজেই এইসব রচনার অস্বাভাবিকতার জন্যেই।

একথাগুলো বলে আমাদের প্রাচীন কাব্যের মূল্যমানকে খাটো করতে চাইছি না কোনক্রমেই। তবে যুদ্ধপ্রসঙ্গে আমাদের কবিমানসের অনাত্মীয়তা এবং উদ্দীপনামূলক কাব্যের লক্ষ্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তাসংক্রান্ত মজুত তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি মাত্র। আমাদের অতীত উদ্দীপনামূলক কবিতাগুলো ঐতিহ্যকেন্দ্রিক, বর্তমানকেন্দ্রিক নয়—মূলত এ-কথাটাই বলতে চাইছি। এর কারণ কি? এমন একটা কঠিন রূঢ় জ্বলন্ত বাস্তব ব্যাপার যে যুদ্ধ, তাইবা আমাদের মনের এত বাইরে রইল কি করে, একেবারেই যে নাড়ীর যোগ নেই?

এ প্রশ্নের উত্তরটা বোধকরি তেমন জটিল নয়। আদতে আমাদের কেউ সাতজন্মে যুদ্ধ দেখেনি। অনেক অনেক আগে যে-সব যুদ্ধকাণ্ড ঘটে গেছে এদেশে, সে সবই ছিল প্রাসাদকেন্দ্রিক, ওপরতলার ব্যাপার, সে সব রাজনৈতিক ডামাডোলে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের যোগ ছিল না, তা ছিল তাদের নাগালের বাইরে। পরে অবশ্য স্বাধীনতার লড়াই আমরা করছিলাম বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি ভিন্ন। এ উপলক্ষে যে রচনা আমরা পাই, তার উদ্দীপনার লক্ষ্যও স্বতন্ত্র। সে কারণে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে স্বাভাবিকতা থাকার কথা এবং এর পারম্পর্যে যে উদ্দীপনা সমগ্র জাতীয় মানসে সঞ্চারিত হওয়ার প্রত্যাশা আমরা করি, তা আমাদের কবিদের সৃজনশীলতার ধাতে আসেনি। তাই তাঁরা জাতীয় প্রয়োজনে উদ্দীপনামূলক কাব্যসৃষ্টির প্রয়াসে অতীতের ওপরেই নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন কেবল।

অতীতের এই সত্যকে সামনে রেখে আজকের দিকে তাকালে আমরা কিন্তু একেবারেই এক ভিন্ন সংবাদের সম্মুখীন হব। কেননা, গত ১৯৬৫

সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধই সম্ভবত আমাদের আবহমান জাতীয় জীবনে প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধ। জাতি সামগ্রিকভাবে এই প্রথম বার একটি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িত হয়েছে, এর ফলে সত্যিসত্যি সারা জাতির মনোভাবকে উদ্দীপ্ত করার অনিবার্য কারণ দেখা দিয়েছে। এ অভিজ্ঞতা বাস্তব এবং সম্ভবত এমন ধরনের শিহরণে এই হলো আমাদের একমাত্র বাস্তব উপলব্ধি। আর তার ফলে আমাদের কবিরাও সম্পূর্ণ জীবন্ত ও সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও জড়িত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এর আবেদনে সাড়া দিতে পেরেছেন। বিগত সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কবিদের রচনা তাই কল্পনার নায়কদের ঘিরে গড়ে ওঠেনি, হাতড়িয়ে সাজানো পরিবেশে ভারাক্রান্ত হয়নি। তাই এ আমাদের কৌতুক ও কৌতূহলের সামগ্রী মাত্র নয়। এ-সব সাম্প্রতিক কবিতা সময় ও অবস্থার ঘনসংযোগে অনিবার্য স্বরূপে গড়ে উঠেছে, এর উদ্দীপনা আমাদের বেঁচে থাকার প্রশ্নে অপরিহার্য দায় বহন করেই স্বতঃউৎসারিত হয়ে উঠেছে। এর ফলে এ-সব কবিতায় লক্ষ্য করি একটি উত্থিত জাতির আত্মবোধনের সংবাদ, এগুলো হয়ে উঠেছে একটি আত্মসংরক্ষণক্ষম শক্তিমত্ত জাতির বিপদকে জয় করার অমোঘ তেজের বাহন। সাম্প্রতিকতার পারম্পর্যে এক অনিবার্য বিশ্বাস্য যথার্থ্যে দ্বান্দ্বিকভাবে অবধারিত এসবের জন্য। এতে আমরা যুগীয় দৃষ্টিকোণ, মানবিকতার প্রশ্ন এবং শান্তির সংকটে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ও মহত্তর প্রতিরোধবোধ একই সঙ্গে পাই।

আর তাই আজকের কবির উদ্দীপ্ত ভাষা লাখ লাখ মৃত সৈন্যের হিসেব পঞ্চাশ হাজারে পর্যবসিত ক'রে আমাদের হাসি জাগায় না, মানুষের অভাবে পাখি এবং গাভীদের সন্ত্রস্ত বিবরণ এ-সব রচনার পংক্তি ভরিয়ে তোলে না, তা এক অদ্ব্যর্থ সত্যের ভাষ্যকার হয়ে ওঠে অপরিহার্য জীবন-সংগ্রামের তাগিদে,

> প্রত্যেকে সৈনিক আমরা, প্রত্যেকে
> সৈনিক, যখন
> বর্গীর ঘোড়া খটাখট খুরের শব্দে,
> অট্টরবে স্বদেশে সহসা
> হানা দেয় ওড়ায়ে বৃশ্চিক চির ঘৃণার পতাকা,
> তখন প্রত্যেকে
> সৈনিক আমরা

প্রত্যেক, সৈনিক।

প্রত্যেকে সৈনিক—আলাউদ্দিন আল-আজাদ

এবং

আমরা জেনেছি
মূল্য যদি দিতে হয় অসহ্য ঘৃণায়
আগুন জ্বালতে হয় আরণ্য হিংসার
বজ্রদীপ্ত ঘূর্ণিঝড়ে সর্বত্রাসী বন্যার তাণ্ডবে
প্রাণ দিতে ছুঁড়ে দিতে হয়
তুচ্ছ তৃণ পালকের মত
তবু তার বিনিময়ে বারম্বার পেতে হবে তপ্তজননীর
মুক্ত শুদ্ধ অঞ্চলের বাতাস।

যে কোনো মূল্যে—সিকান্দার আবু জাফর।

এ শপথ বানানো নয়, কারো একার নয়। সারা জাতির, সব মানুষের। কেননা,

আজ নয় দ্বিধা, আজ নয় কোনো শোক,
অগ্নি শপথে জ্বলে অগুনতি চোখ:
শুধতেই হবে মাতৃভূমির ঋণ।

শপথের বিদ্যুৎ---শামসুর রাহমান।

সত্যি, মাতৃভূমির ঋণকে শোধবার এমন তাগিদ এর আগে এমন করে আর কবে আমরা অনুভব করেছিলাম ?

আমাদের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি

আমাদের দেশে বাস্তবতা ও বাস্তবতাবিরোধিতার মধ্যে সাহিত্যের গতি মেঘরৌদ্রের আলো-ছায়ার খেলাতে যেন আবরিত হয়ে চলেছে। কোনো একটা বিশেষ প্রবণতাই শক্ত ভিত পাচেছ না—ফলে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যই পরিণতির স্বরূপ পাচেছ না। কেন এই নেতিবাচক অবস্থা, তা নিয়ে খুব যে আলোচনা হয়েছে, তেমন কথা বোধকরি বলা যায় না।

আমাদের সাহিত্যের ভেতরের বিকাশ-শক্তি যতটুকু, কিংবা এর ভেতরে সৃজনীতেজ রয়েছে যে পরিমাণ, একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি তেমন নেই এ-সত্য উপরিউল্লিখিত নেতিবাচক পরিস্থিতির একটি অন্যতম কারণ হতে পারে। কেননা লেখকরা প্রকাশকও পান না, তাদের গুণগ্রাহী নিশ্চিত পাঠকও নেই। সুতরাং তাদের সাহিত্যের প্রচার তথা ব্যবসার দিকটা একেবারেই নাজুক রয়ে গেছে। অথচ এ কথাও সত্য, একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টি-সম্পদ বাজারে বিকোবার ব্যবস্থা পাশাপাশি পাকাপোক্ত না হলে, সে সাহিত্যিকের চলে না, তার সৃষ্টিরও যথার্থ প্রতিষ্ঠা ঘটে না।

আর একটি কারণ রয়েছে যা সাহিত্যের স্বভাবপুষ্ট এবং সেই সঙ্গে জনগণের নিকট তা প্রিয় হয়ে ওঠার জন্যে খুবই আবশ্যক। তা হলো জীবনের ঘটমান বাস্তবতার প্রকাশ ও তার তাৎপর্য বিন্যাস। বিখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক মের্ক গ্যেটেকে একটি নির্দেশ দিতে গিয়ে সাহিত্য সম্পর্কে একটি খাঁটি সত্য প্রকাশ করেছেন। তিনি গ্যেটেকে বলেছিলেন, "তোমার চেষ্টা তোমার অবিচলিত লক্ষ্য হচ্ছে যা বাস্তব তাকে কাব্যরূপ দেওয়া। অন্যেরা চেষ্টা করে তথাকথিত কবিত্বের সৌন্দর্যকল্পনার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে—যার অবশ্যম্ভাবী ফল নির্বোধ অর্থহীনতা।"

বস্তুত আমাদের সাহিত্যেরও এক বিপুল প্রয়াস এমনিই বাস্তবতাকে ঠিকভাবে বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে না পেরে তথাকথিত সৌন্দর্যের চর্বিত চর্বণের মধ্যে আলোড়িত ও অপচয়িত হচ্ছে। তাই আমাদের সাহিত্যের সামনে মূলত দুটো সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত, আমাদের পরিপার্শ্ব ও বাস্তবতার সঙ্গে যোগ স্থাপন করা এবং সে-সবের স্বরূপ ও সক্রিয়তার শিহরণগুলো আবিষ্কার করা এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের সাহিত্যের বাজার সৃষ্টি করে এর সাংগঠনিক ভিত্তির ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা, যা এর বিকাশের জন্যে অপরিহার্য।

আমার মনে হয়, বিগত যুদ্ধে আমাদের সাহিত্য প্রথমবারের মতো একটা জোরালো বাস্তবতার আঘাত পেয়েছে। এই যুদ্ধ নিয়ে কি সাহিত্য হবে আমি জানিনে। তবে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রয়োজন কী এ সম্পর্কে খুবই অর্থময় ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যুদ্ধের ফলে সাহিত্যিকদের হয়েছে। আমাদের জীবনে ঘটনা খুব বেশী নেই অথচ সাহিত্যের জন্যে ঘটনার খুবই দরকার। বিশেষত মহৎ সাহিত্যের জন্যে মহৎ ঘটনাও দরকার। বিগত যুদ্ধের প্রকট বাস্তব ধাক্কার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সাহিত্যিকদের ঘটনা অনুধাবন এবং তার তাৎপর্য অনুশীলন বৃদ্ধি পাবে ও বহুমুখী হবে বলে মনে হয়।

তাছাড়া সাহিত্যিকরা এই যুদ্ধে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অন্তত দুটো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পেরেছেন। প্রথমত যুদ্ধ নয়—শান্তিই জীবন ও প্রগতির জন্য স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয়ত আমাদের ব্যাপক ও দীর্ঘায়ত ঐতিহ্যসম্পদের মধ্যে সবচেয়ে শিহরণমূলক হতে পারে শুধু তাই যা আমাদের নিজেদের তৈরী—আমাদের জাতিগত ভূমিকায় যা পরিগৃহীত হয়েছে।

নিজের সৃষ্ট এমন ঐতিহ্যের স্পন্দনেই সম্পর্কগ্রথিত অন্যান্য ঐতিহ্যিক উপাদান সত্যিসত্যি বাঙ্ময় হতে পারে।

আমাদের কাব্য-সাহিত্যে নগর-জীবনের আলেখ্য

নাগরিকতা বলতে প্রাচীন শিল্পতাত্ত্বিকদের কেউ কেউ বৈদগ্ধ্য বা মার্জিত রুচি বোঝাতে চেয়েছেন। রাজসভার সাহিত্য এবং লোকসাহিত্যের ভেতরকার ভেদরেখাটি যতই মোটাদাগে প্রবল হতে শুরু করেছে, ততই লক্ষ্য করা গেছে সাহিত্য-স্বীকৃতির শিরোপা নাগরিক-সাহিত্যের কোল-জুড়ে একপেশে আসন পেতেই অধিকতর আগ্রহী। অর্থাৎ গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতার যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সাহিত্যের মূল ধারাটি নাগরিক-সাহিত্য হিসেবেই গঠিত ও বিকশিত হতে দেখি। দেশ-জীবনের নিয়ন্ত্রণ–ক্ষমতা নগর-সভ্যতার হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার অবধারিত ফল হলো এইটে। সাহিত্যের বিবর্তনেও এ ঘটনা ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রতিটি দেশেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত আর সাহিত্যে নাগরিকতার একচ্ছত্র আধিপত্যের সূচনা একই কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত। আধুনিক যুগ গ্রাম-জীবনকে কোণঠাসা ও বিকাশরহিত করেছে এবং অনিবার্য নিয়মে এ ধারার সঙ্গে তাল রেখে নাগরিক-সাহিত্য লোকসাহিত্যকে পাশে ঠেলে তার নিজের প্রতিষ্ঠা একক ও অনন্য করতে চেয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এই সুস্পষ্ট পালাবদলের শুরু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর থেকেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

নাগরিকতাকে অবশ্য আমরা শহুরে মেজাজ বা শহুরে জীবন বলেই সাধারণভাবে বুঝতে চাই, যাকে অন্য কথায় বৈদগ্ধ্য বা মার্জিত জীবনা-চরণের নামান্তর বলে এখনো এক করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এবং একই প্রতিফলনকে বলতে চাই নাগরিক-সাহিত্য। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলেই এটা স্পষ্ট হবে যে, আদতে আমাদের আজকালকার স্বীকৃত সাহিত্য প্রয়াসের সবটাই মূলত নাগরিক। এখন যেমন ইচ্ছে করলেও লেখকের নামবিহীন মৌলিক লোক-সাহিত্য রচনা সম্ভব না, তেমনি

বর্তমানের সাহিত্যের কোন অংশকে লৌকিক কী গ্রামীণ কিংবা কোন অংশকে নাগরিক বলে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ বাঁটোয়ারা করাও যায় না। আমাদের আজকের সাহিত্যে পল্লীর আলেখ্য থাকতে পারে, নির্জলা গ্রামের রূপও বর্ণিত হতে পারে এবং এমনকি আঞ্চলিক রঙ ফুটিয়ে তোলার জন্যে নির্দিষ্ট প্রেরণায় উপন্যাস কী কাব্যও রচিত হতে পারে, যাকে আমরা রিজিওন্যাল বা আঞ্চলিক সাহিত্য বলি, কিন্তু তবুও এ-ক্ষেত্রে শেষ কথাটি এই যে, এ-সবই বর্তমান সাহিত্যের আওতাভুক্ত, সবই আজকের নাগরিক-সাহিত্যেরই অঙ্গবিকাশের অবিভাজ্য উপকরণ। এর কারণ কি? কারণটা হলো আধুনিক লেখকের দৃষ্টিভংগী, জীবন-চেতনা, সময়-সজাগতা। আজকের লেখক যে বিষয় বা উপকরণ নিয়েই লিখুন না কেন, আধুনিক যুগ তাঁর মনটাকে যে কাঠামোতে গড়ে-পিটে তুলেছে, তাই হবে তার রচনার নিয়ন্তা-শক্তি। একজন আধুনিক লেখক চেষ্টা করলেও আর কখনও একজন লোক-কবির মতো লিখতে পারবেন না। কারণ, লোক-কবির সেই আত্মসম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ মনটি সমাজ থেকে কবে হারিয়ে গেছে। গ্রাম তাঁর রচনায় আজো থাকবে, কারণ গ্রাম এখনো বজায় আছে। কিন্তু তাঁর গ্রামকে দেখার দৃষ্টিকোণটি আধুনিক ও নাগরিক না হয়ে আর পারবে না, এ-যুগের সর্বগ্রাসী প্রভাবের এইটেই নিয়ম। তবে এ-কথা সত্য, একজন আধুনিক লেখকের ভেতরও এখনো আমরা গ্রাম্যতার রেশ খুঁজে পেতে পারি। এটা আসলে সংস্কারজাত। এরও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে এবং তা হলো এই যে, এখনো আমাদের সভ্যতা পুরোপুরি নগর-সভ্যতা হয়ে ওঠে নি, ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ-প্রভাব এখনো সর্বত্র স্তরে স্তরে জড়িয়ে আছে। সুতরাং এর প্রতিফলন যে আমাদের সাহিত্যেও ঘটবে, সেতো খুবই স্বাভাবিক কথা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিচ্ছিন্ন এবং গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সাহিত্যও স্বতন্ত্র নিয়ন্তা-শক্তি হিসেবে এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এ-ব্যাপারে নিষ্পত্তিমূলক কথাটি এই যে, এ-যুগে যে-কোনো রাষ্ট্রের অধিবাসী মাত্রেই নাগরিক—একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পিত সভ্যতাধারা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সক্রিয় অংশবিশেষ—তিনি গ্রামেই থাকুন কী শহরেই থাকুন, দেশবাসী আর সবার সঙ্গে একই প্রতিক্রিয়াপন্নতায় তিনি কম বেশী জড়িত, তাঁর মৌলিক মানস-কাঠামো ও দৃষ্টিভংগীও যুগের অমোঘ নিয়মের একই সূতোয় বাঁধা। একজন আধুনিক লেখকও ঠিক এমনি একজন নাগরিক। সুতরাং, তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্যও যত বিপরীত-ধর্মিতা ও বিচিত্র উপকরণেই মিশ্রিত হোক না কেন, মূলত তা

নাগরিক সাহিত্য ছাড়া কিছু নয়। কেননা, এর মৌলিক দৃষ্টিভংগী ও প্রতিক্রিয়াটাই নাগরিকের।

এতক্ষণ আমি যা বললাম, তাতে আমাদের বর্তমান কাব্য প্রয়াসের পুরোটাই যে আমি নাগরিক বলে মনে করি, তা বোধ করি স্পষ্ট। তবে, এ-হলো আমাদের কাব্য-সাহিত্যের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কথা। এখানে আমাদের কাব্য-সাহিত্যের সবটাই এক, এ পর্যায়ে ব্যবচ্ছেদ চলে না, বিভিন্নতায় আলাদা করা যায় না। কিন্তু, নগর-জীবনের রূপ বর্ণনার বিষয়টি এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন, এটা হলো আমাদের কাব্য-সাহিত্যের স্বরূপগত দিক। এ-ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কবির বিশিষ্ট প্রবণতা অবশ্যই রয়েছে। যেমন, স্বভাবগতভাবে আধুনিক সব কবিই নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কোনো বিশেষ একজন কবি নগর-জীবনের বিষয়বস্তুকেই অধিকহারে তাঁর কাব্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর ফলে তাঁর কবিতার রূপ ও রস, প্রবণতা ও মেজাজ এবং প্রবর্তনা ও রুচি আলাদা ভংগী ও বিশেষত্বে ফুটে উঠতে পারে। আমাদের কাব্যে তরুণ কবিদের মধ্যে এই বিশেষত্ব অধিকতরভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরিণতিমুখী নগর-সভ্যতার অগ্রসর ফসলের সঙ্গেই তাঁদের প্রথম পরিচয় বলে নগর-জীবন তাঁদের মজ্জাগত হতে পেরেছে এবং এই স্বাভাবিক কারণে আধুনিক নাগরিক হিসেবেও তাঁরা অনেক পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন অনেকটা মৌলিক সূত্রেই। সেজন্যই নগর-জীবনের চিত্রকার হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা সহজাত প্রেরণা লাভ করেছেন। কিন্তু আমাদের সমাজগঠনের মিশ্র অবস্থাজাত বৈচিত্র্য তাঁদের শহুরে জীবনোপলব্ধি, দৃশ্যবোধ এবং মনোভাবকেও বিচিত্র করে তুলেছে, একরৈখিক হতে দেয় নি। এ-ব্যাপারে কিছু তথ্যগত উদাহরণের সাহায্য নিলেই বিষয়টি অধিক পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়।

প্রথমেই সানাউল হকের 'সম্ভবা অনন্যা' থেকে একটা সনেটের শরণ নেয়া যাক :

    •• ••• নিরুপায় যদি আসে
সন্দ্বিপ সমুদ্র ঢেউ, মত্ত হাতি পাল—
একফুঁয়ে হাবুডুবু, নিশ্চিহ্নিত গ্রাসে
বউ ভিটি কাঁথা কাসা, মাছধরা জাল।
কী সন্ত্রাস যারা বাঁচে, ছিন্নভিন্ন আশা।
বাহুলগ্না এলো খোঁপা হয় কি অমর

জলমগ্না হলে? সত্য নয় তুমি জানো
আর জানি আমি। খিল আঁটা ভালবাসা
একদিন হবে জয়ী? বঙ্গোপসাগর
ফুঁসে ওঠে, দাঁত কাটে পাতালের দানো।

বাহ্যত এ কবিতার কোথাও নগর-জীবন নেই। বরং প্রকৃতির রোষ ও প্রতীক এবং গ্রাম্যজীবনের ছায়াই এতে একাকার। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে, নগর-জীবনে বদ্ধমূল এবং উন্নততর জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাসম্পন্ন একটি প্রত্যাশী মনই এতে কথা বলছে। এ কবিতায় একদিকে যেমন গ্রামের বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু ও পর্যুদস্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্ষোভ সোচ্চার, অন্যদিকে তেমনি এর পরিবর্তন কামনার আর্তি পরিস্ফুট। সময় চেতনার হাত ধরে নাগরিক চেতনা এখানে কাজ করে গেছে এবং বর্তমান-নিবিষ্টতাই এ ক্ষেত্রে কবির মনোভংগী নিয়ন্ত্রিত করেছে। এ কবিতার পাশাপাশি শামসুর রাহমানের একটি কবিতাংশ বিচার করলে ভিন্নতর তথ্য পাওয়া যাবে। 'দুপুরে মাউথ অর্গান' কবিতায় শামসুর রাহমান বলেছেন :

ট্রাফিক সিগন্যালের
সবুজ বাতিটা ফের নতুন আশার মতো ঝল-
মল জ্বলে, কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মোটর পাশাপাশি
হঠাৎ হরিণ হতে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে বুঝি
রোদচেরা সুরের গমকে।
এভেন্যুর ফুটপাতে
উন্মত্ত বালক নেই, মাউথ অর্গান নাচে শুধু
দূরে-কাছে বাতাসের ঝঙ্কৃত সঙ্গীতে। দুপুরের
রৌদ্রের বর্ষায় লোকগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায় :
প্রত্যেকটি মানুষকে মনে হলো স্বপ্নে-ভেসে-ওঠা
দ্বীপের মতন, লুপ্ত স্মৃতির সন্ধানে চমকিত।

স্পষ্টতই এর বিষয় নগর-জীবনের গভীরে বদ্ধমূল। অথচ এর আর্তনাদ বিশুদ্ধ প্রকৃতির জন্যে। বিস্তৃত চরাচরের মুক্তি শহরের পুনরাবর্তন-তিক্ত জীবনে প্রতিহত হয়ে পড়ছে পায়ে পায়ে। ট্রাফিক সিগন্যালের কঠিন নিয়ম শৃংখলিত প্রতীকের কনট্রাস্টে মোটর গাড়ীর হঠাৎ উধাও-হরিণ হয়ে যাওয়ার নিরুদ্ধ বাসনা এখানে উচ্চারিত। এ বদ্ধজীবনে সুরের আদি ও

অকৃত্রিম মূর্ছনা সাময়িক স্বাপ্নিক মুক্তি আনে, তখন লুপ্ত-স্মৃতির সন্ধানে মানুষ চমকিত হয়ে ওঠে। নগর-জীবনের প্রতিক্রিয়াই এ কবিতায় ধ্বনিত, কিন্তু নগরক্লান্ত এক ভিন্ন সুরে। অথচ এ-যে বর্তমান যান্ত্রিকতার-সমালোচনায় অত্যন্ত আধুনিক, তাতেও কোনো সন্দেহ নাই। এ কনট্রাস্ট-বোধ সাম্প্রতিকতানিবিষ্ট মনেরই উৎসারণ। কবির নিজস্ব আকাঙক্ষা ও ধারণার ইংগিত বহন করে, যা নগর-জীবনের তিক্ত ফলশ্রুতির সঙ্গে সহজ আপোসে প্রস্তুত নয়। পক্ষান্তরে আমাদের কবিতায় এমন কিছু অংশও আছে যেখানে নগর-জীবনের চিত্র কবির ধারালো ভাষায় আক্রান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তার লক্ষ্য মোটেই বিশুদ্ধ প্রকৃতি-কেন্দ্রিক নয়—কোন কনট্রাস্ট হিসেবেও তা উৎকীর্ণ নয়। যেমন :

ঐশ্বর্যে ঝিলিমিলি শহর
পানাক্রান্ত শরীর
বার থেকে ক্যাবারে অবিরল
রৌপ্যের হরিলুট
তোমাদের চোখের স্বপ্নের সভাশেষ।

আবদুল গনি হাজারীর এ-কবিতায় নগর-জীবনের ক্লান্তি নেই। বরং এক ধরনের সভ্যতা যে এই জীবনযাত্রাকে আবিল করে তুলছে তারই পরিণতি সংবাদ এতে ঘোষিত। এ নগর-চেতনা ব্যবস্থার পরিবর্তনকামী। ঠিক এরই বিপরীত এক মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই আমাদের তরুণতম কবিদের মধ্যে যাঁরা বর্তমানের প্রতিক্রিয়াজাত বিকারেই কাব্যের মুক্তি চান। কোনো সমালোচনা, কোন কনট্রাস্ট-বোধ বা পরিবর্তন কামনা নয়, তাঁদের কবিতায় নগর-জীবনের বিকারগ্রস্ত অংশটুকুই শুধু অবিকৃতভাবে উপস্থিত এবং এর হলাহলের বিষ জ্বালাতেই তাঁরা মোক্ষ খোঁজেন, কাব্য-সিদ্ধি খোঁজেন। আমাদের কাব্যে নগর-জীবন রূপায়ণের এই বিচিত্র ধারায় আরেক প্রচেষ্টা আছে, যা শহর ও প্রকৃতিকে মেলাতে চায়। এই সমন্বয় প্রয়াসও আমাদের কাব্যের রস-বৈচিত্র্য ঘটিয়েছে সন্দেহ নেই। ফজল শাহাবুদ্দীনের 'গ্রীষ্মের আত্মায়' কবিতা থেকে কিছু অংশ এ ধারারই নমুনা তুলে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি :

গ্রীষ্মের ক্ষুধার্ত উত্তাপে সবই যখন ইঞ্জিনের
ধোঁয়ার মত ক্লান্ত
যখন কেউ পথে বেরুতে চায় না যায় না বাইরে

রৌদ্রের আবর্ত থেকে মুক্তি পেতে পশু পাখী
কীট আর পতঙ্গেরা
যখন এক টুকরো ছায়াকে আইসক্রীমের মতো
কেটে কেটে কেটে মসৃণ বিলাসে খেতে পারে
ডি আই টি রোডের শরীরটা উন্মত্ত চাকার
ক্রমাগত ঘর্ষণে যখন
দগদগে অসংখ্য ক্ষতচিহ্নে অশ্লীল হয়ে পড়ে
আছে
সুন্দর সুঠাম শরীর নিয়ে মিসেস আমেদ যখন
দুপুরের খরগোশের মতো হাঁপাচ্ছেন এবং তাঁর
মুখের ফাউণ্ডেশন গ'লে গ'লে পড়ছে তার প্রথম
প্রেমের স্মৃতির মতো
চোখের সামনে যখন ভেসে উঠছে নিজের এয়ার-
কণ্ডিশাণ্ড ড্রইংরুম
ফ্রিজ ফ্রেশলিমন ঠাণ্ডা মাল্টার রস
বরফের কুচি
কিংবা মনে পড়ছে কণ্টিনেণ্টের কোনো শান্ত
শীতল অপরাহ্ণ
ঠিক তেমনি সময় গ্রীষ্ম আমাকে ডাক দিয়েছে
আর আমি বৈশাখের আত্মার জঠরে উন্মাদ
অশ্বারোহীর মতো ছুটাছুটি করছি
কিছু স্বপ্ন কিছু দৃশ্য কিছু স্পর্শ সেখান থেকে
ছিনিয়ে আনবো বলে
আমি অসহ্য দহনের রাজসিক আবর্তের মুখোমুখি
এসে দাঁড়িয়েছি
কেন না আমাকে কেউ এক ফোঁটা জল দেয় নি
ছায়াও নয়।

আমার দেশঃ বিপর্যয়ের আলোকে

আমার এক বন্ধুর হাতের ভেতরের দিককার পেশীর চওড়া জায়গা-টায় অদ্ভুত এক আঁচিল আছে। সেটা দেখতে ঠিক আমাদের দেশের মানচিত্রের মত। আমার বন্ধুর খুবই গর্বের বস্তু কিন্তু সেটা। আমা-দেরকে প্রায়ই সে তা একবার না একবার দেখাবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। আর যখনই সে তা দেখায়, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'আমার দেশ' 'আমাদের দেশ।'

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, ঐ একটা জিনিস সে এতোবার জাহির করবার উৎসাহ পায় কি করে, আর আমরাই বা তাতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠি না কেন। বন্ধুবরের তাতে যদি স্বদেশের মানচিত্র না থেকে থাকতো একটা ভালুক, তাহলে কি সে ওটা নিয়ে এত উৎসাহ বোধ করত? নয়তো বা একটা গোলাপ ফুলই আঁকা থাকতো তার হাতে, তাহলেই কি সে অমন গর্বিত উল্লাসে বারবার তুলে ধরাতে পারত তা?

মনে হয় পারতো না। কোনো কিছু নিয়েই তার অহংকার অমন অনিঃশেষ হতে পারতো না। কিন্তু দেশ একেবারেই অন্য ব্যাপার। স্বদেশ নিয়ে কারোরই উৎসাহের শেষ নেই, আগ্রহের শেষ নেই। স্বদেশকে ভালোবাসা অক্লান্ত, স্বদেশকে ঘুরে ঘুরে দেখা, ফিরে ফিরে ভাবা অনিঃশেষ। স্বদেশের গল্প ফুরোয় না, স্বদেশকে তুলে ধরার আকাঙক্ষা কখনো শ্রান্ত হয় না।

আমাদের বন্ধুর গায়ে স্বদেশের ছাপ তাকে এক স্বতন্ত্র আনন্দ দিয়েছিল। তাই নিয়ে এক বিশেষ মহিমাবোধ ছিল তার, ছিল অহঙ্কার। স্বদেশকে ঘিরে তা ছিল বলেই আমরাও সেই সুন্দর অহঙ্কারের মহিমায় মিলিত হতে কখনো অরুচি বা ক্লান্তি বোধ করতাম না।

কিন্তু সবার কাছেই কি ঐ আঁচিলের মানচিত্রের মতো স্বদেশ জেগে থাকে, সচকিত সাড়ার মুখর হয়ে থাকে? তা তো নয়। দেশ আমাদের

স্নায়ুতে, চেতনায়, স্মৃতিতে, ধারণায় নিঃশব্দে মিশে থাকে, নিস্তরঙ্গ ডুবে থাকে। আমাদের একজন প্রধান কবি, শামসুর রাহমান, উপমায় স্বদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের রূপ তুলে ধরেছেন এই বলে যে,

আমার মায়ের নিঃশ্বাসের মতো
এ দেশের বাতাস,
আমার প্রিয়ার চোখের মতো
এ দেশের আকাশ,
আমার পিতার বয়েসী ললাটের মতো
এ দেশের উদার মাঠ।

তার অর্থ এই যে, মায়ের নিশ্বাস, প্রিয়ার চোখ এবং পিতার অভিজ্ঞ অথচ সহনশীল স্মিত ললাটের মতই স্বাভাবিক আমাদের পরিপার্শ্ব। এর কোনো বিশেষ ভিন্ন অর্থ সব সময়ের জন্যে আমাদের উচ্চকিত করে না, প্ররোচিত করে না, স্বতন্ত্র অঙ্গুলি সংকেতের আকর্ষণে বিশেষ মর্যাদাও বার বার আদায় করে নেয় না। অথচ মার নিশ্বাস, প্রিয়ার চোখ, পিতার সহনশীলতা এ সবই আমাদের কাছে মহার্ঘ—জীবনের মহত্তর মূল্যে এ-সবের সম্মান আমরা দিই।

আসলে স্বদেশটা আমাদের কাছে এমনি সহজ ও স্বাভাবিক, আবার এমনিই মূল্যবান। একে নিয়ে আমরা এমনিতে উচ্চকিত নই, আমাদের সব সময়ের উত্তেজনা একে ঘিরে আলোড়িত নয়। আকাশ বাতাস মাঠের মতোই, আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মতোই আটপৌরে এ আমাদের কাছে। কিন্তু বিশেষ তুলনায়, বিশেষ প্রশ্নে, বিশেষ সঙ্কটে স্বদেশ এক মুহূর্তে আর সব কিছুকে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে এসে দাঁড়ায় সবার আগে। বাবার মার প্রিয়ার সন্তানের সম্মানের অস্তিত্বের প্রশ্নের মতোই স্বদেশের সাড়াই প্রধান হয়ে ওঠে, স্বদেশের মুখই সবার মাথার ওপরে খাড়া হয়ে ওঠে।

এই আমাদের স্বদেশ, রক্তের মতো অগোচরে সহজে আমাদের মধ্যে মিশে আছে জানতেও পারি না। অথচ যখনই এর প্রতি সজাগ হই, দেখি এর চেয়ে দামী আর কিছু নেই, এমন কিছু নেই যা আমরা এর জন্যে ছাড়তে পারি নে। কিন্তু সব সময় স্বদেশ তো এমনভাবে জানান দেয় না। জানান দেয় তা বিশেষ মুহূর্তে। আসলে মহৎ ঘটনা না ঘটলে স্বদেশকে আমরা তেমন করে জানতেও পারিনে। আর তার ফলে

যে জাতির জীবনে মহৎ ঘটনা যত বেশী তার স্বদেশের পরিচয়ও ততো মহার্ঘ ও বিচিত্র হয়ে উঠতে পারে, তার আন্তরিক ও মানসিক, উন্মুখর ঘটনা ও কল্পনার সম্পদও ততো ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠতে পারে।

এক অকস্মাৎ বিপৎপাত স্বদেশের মহৎ অস্তিত্বকে আমাদের মনেও আলোড়িত করে আমাদের চেতনার এক সুস্থ স্রোত-পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমাদের যাঁরা প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে একে নেন নি, কিংবা অসচেতন মুহূর্তেও এ-থেকে অমানুষিক ও ভেদাভেদ-মূলক হিংসা ও ঘৃণা-শিহবিত উদ্দেশ্যকে মিটিয়ে নেয়ার ইচ্ছেকেই সর্বস্ব জ্ঞান করেননি. এ সত্যিই আশার কথা। এঁদের লেখা এ সত্যকেই প্রশ্নাতীত করেছে। সঙ্কটের ডামাডোলেও শুভ চেতনার বিজয় ঘটেছে—এ-কথা ভাবতে ভালো লাগে, স্বস্তি জাগে মনে। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক:

জাগাও জাগাও তুমি মণ্ডূকেব কূপে
দূব নীল আকাশের স্বপ্নেব আভাস
জাগাও ব্যাপ্তির মাঝে—তোমব নদীব মত আব
বিস্তৃত মাঠের মতো মুক্তি-চৈতন্যের তীব্র হাহাকারে,
এবং উদার করো আমাদের। দৃষ্টিতে ফুটুক বিশ্বরূপ
সীমাহীন মহিমায।

[প্রতিদিন সূর্যোদয়—শামসুব বাহমান]

সঙ্কট মুহূর্তেও যে জাতির মনোভাব এই ভাষায ব্যক্ত হয়, সে জাতি পরাভবচেতন নয়, হীনমন্য নয, বিপদে কখনো বিমূঢ় হবার মতো নয়। বরং তা আত্মসংস্থিত, আত্মবিশ্বাসী। বিপুলতা ব্যাপকতা নিয়ে সমগ্র পৃথিবী তার সম্মুখে এবং বিপদকে জয় কবে সামনে এগিয়ে যাওয়াব উদার দৃষ্টি, মহৎ শক্তি ও সংকীর্ণতামুক্ত মনোবলও তার আয়ত্তে। এ-ভাষা একক কোনো কবির ভাষামাত্র নয়। এ-অনুভূতি আমাদের প্রায় সকল সৃজনী প্রতিভারই অভ্রান্ত মানবিক চেতনার প্রতিনিধিত্ব করছে। আমাদেব স্বদেশপ্রেম সঙ্কটে শান্তির মহিমাকেই অব্যর্থ করে তুলেছে।

তিমির হননের গান

প্রত্যেকেরই জীবনে হয়তো এমন মুহূর্ত আসে, যখন সে তার অস্তিত্ব নিয়ে দুঃখ পায়। আমি বলবো—না, নিষ্ফলা হতাশাই এই দুঃখ বোধের একমাত্র সগোত্র। হয়তো এমনও হতে পারে, মনের কাছে এই অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের জন্ম হয়েছে আরো বৃহত্তর এক জিজ্ঞাসা থেকে। জিজ্ঞাসা এই যে, আমি কি কবব? কী আমার কাজ, এই যে খেয়ে-পরে আমি আছি, বেঁচে আছি দিনের দীপ্তিতে, রাত্রির সুপ্তিতে এর কোন মুহূর্তের সঙ্গে আমি সংলগ্ন হবো?

রাত্রিদিন যারা মেহনতে লিপ্ত, জীবনকে টিকিয়ে রাখাব অপব্যয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ পরিসরে যারা অনর্থক স্ফীত একটা আয়তনে নিজেকে ঠেসে রাখার নিতান্ত নিয়তিকে নিয়ে ব্যস্ত, তাঁরা হয়তো লুপ্ত হয়ে আছেন সময়ের হলকায়। কিন্তু তবুতো একজন এমন আছেন, হয়তো প্রতিজনই এমন একজন, যিনি জীবনের মধ্যে থেকেও জীবনের একজন দর্শক। তাঁর মনে প্রশ্ন এলো, কী আমি করব? এ প্রশ্ন তাঁর স্নায়ুর তারে কঠিন আঘাতে মুখর সংগীত তুললো। যন্ত্রণায় সে ছিঁড়ে যাচ্ছে, মৃত্যুর প্রতীক এক নিদারুণ শকুনি যেন বিশাল পাখায় চরাচর আচ্ছন্ন করে তার তীক্ষ্ণ চক্ষু ঠিক ভুরু জোড়ার মাঝখানে ঠিকরিয়ে ফেলার জন্যে অনেক দূর থেকে শুধু আসছেই—আসছেই। আর তিনি হাত পা ছেড়ে ওর আসার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত। কিন্তু এ-ও জানেন তিনি মনে মনে সেই শকুনির আসা কোনদিন শেষ হবে না। কেননা, ওর আসার শুরু আছে. শেষ নেই।

এও কি এক ধরনের জীবন, সকল সম্ভাবনাই যেখানে স্থূল হয়ে অনিঃশেষ হয়ে আছে?

আমি একজন লেখককে জানি, যাঁর মনের অবস্থা এমন। তিনি সিনিক নন, কিন্তু তবু আমি জানি আপনারা তাঁকে নিউরোটিক বলবেন।

আপনাদের এই সম্ভাব্য মন্তব্যটা ঠিক তেমনি হবে, যেমন হলো আমার নিজের থেকে তাঁর মনের চেহারা আঁকার চেষ্টাটা। কিন্তু তা যা-ই হোক, লেখক তিনি এবং জীবনের ছবি তাঁর মনে কী রং নিয়েছে, তা জানা আমাদের প্রয়োজন। তাঁর ধারণা আমাদের কাছে মূল্যবান। কারণ, তিনি লেখক। তিনি তাঁর ধারণাকে লিপিবদ্ধ করবেন, তাঁর সৃজনী-স্বাক্ষর সমাজের কাছে যুগ-মানসের বিধৃতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই।

এইটে চিন্তার বিষয়। শিল্প-অভিব্যক্তিকে আমরা তিমির হননের গান বলেই বাসনা করি। দুঃখের পরিচয় যদি ভারাক্রান্ত পাথরের রূপ নেয়, তবে আমরা দুঃখের সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা শ্বাস টানার হাওয়ার উৎসমুখ জানালা পাব কোথায়? শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দই—এই কথাটা রক্ষণবিশ দার্শনিকরা কী কারণে চিরকাল জোর করে দাবি করেন, তার অর্থ এখানে কিছুটা হয়তো স্পষ্ট হয়—যদিও তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্যের হেরফেরটা আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট।

এই কথায় আমার আর একটা কথা মনে পড়লো। সমাজ-ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য আঁকতে যদি কোন ঔপন্যাসিক কেবলই অত্যাচারীর দুর্বলতাকে তুলে ধরেন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তোলার সংগ্রামের পরিণতির দুর্বলতাকেই এঁকে চলেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্যের সবটুকু ব্যর্থ হবে বলে মনে হয়।

কারণ ওতে তিমির হননের গান অধিকতর তিমিরেই পর্যবসিত হবে। ভয়কে দূর করার বীরদর্পিত পদক্ষেপ অধিকতর ভীতুই হয়ে পড়বে। নয় কী?

হায়রে আশায় আশা-কল্পিত প্রাণ কোন পরমার্থের অণ্বেষার তুমি গোলকধাঁধায় ঘুরছো?

এই আমাদের যুগটা কেমন? আমার যদি বোধ থাকে, তবে আমি এমন কথা বলতে চাইবো যা বলতে বুদ্ধি আমার সায় দেবে না। তবু কথা তো থেমে থাকে না। কথার শিল্পরূপের উৎসারণের উৎসাহেরও বুঝি অন্ত নেই। কিন্তু কথা যখন সত্য হতে চাইলো, প্রেরণা তখন মুখ লুকালো, পরিবেশ তখন তার জাগতিক বুদ্ধি নিয়ে হা হা করে পথ আগলালো। আর তখনই—ঠিক তখন থেকেই সেই শকুনিটা ঠিক ভুরু জোড়ায় মাঝখানটায় ঠোকর দে'য়ার জন্যে কেবলি উড়ে আসছেই, আসছেই।

আমার বন্ধুর দু:খকে আমি বুঝি, তার অস্তিত্ব কেন কোন অর্থ খুঁজে পায় না, সেই অর্থ আমার প্রাণে এসে স্পর্শ করছে। এবং সেই জন্যই তো তার অস্তিত্বকে আরও অনেক বেশী ভালোবেসে ফেলেছি। কবে তিমির হননের গান বিস্ফোরিত হয়ে বেজে উঠবে তার কণ্ঠে, তার কণ্ঠের অনিঃশেষ ঐকতান জীবনকে মৃত্যুপথ থেকে জীবনের পথে পথ দেখাবে? আবার? কবে?

রূপালী স্নানের কবি

নারী আর প্রকৃতির অবধারিত অর্চনার মধ্যেই অধিকাংশ তরুণ কবিদের রচনার শুরু হয়। একথা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে আমি দাঁড় করাতে চাইনে। তবে কথাটায় সত্যের অংশ যে অনেকখানি তা বোধ করি কেউ-ই অস্বীকার করবেন না। এই রকম আর একটি সত্য এই যে, অধিকাংশ তরুণ কবিরই আবার রচনায় পরিণতি আসে নারী এবং প্রকৃতি-সর্বস্বতাকে অতিক্রম করেই। কেননা জীবন আর পৃথিবীর এই শোভিত মণি দুটোর সঠিক তাৎপর্যকে বোঝার জন্যও নাকি বাস্তবতার নীচুমুখি আটপৌরে সর্বজনীন মিশেল স্রোতে ঢেউ ভাঙার প্রয়োজন আছে। আর জীবনের অন্যতর যা সবকিছু রয়েছে সে-সবের কথা তো বাদই। মনে পড়ে দশ-বারো বছর আগে শামসুর রাহমান যখন প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল কাব্যের এই সরল রাজসড়কেই।

'চাঁদ, ফুল, পাখী, মেঘ নক্ষত্র, শিশির, আর নারীর প্রণয় আজো মিথ্যা নয়'—আজো মিথ্যা নয় কথাটার মধ্যেই সংশয় জড়িয়ে আছে। তবুও শামসুর রাহমানের প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে সামগ্রিকভাবে নব-যৌবনসুলভ আসক্তির গভীরতাই প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' শামসুর রাহমানের প্রথম বই বটে, অথচ নারী ও প্রকৃতি-সর্বস্ব কবিতা বলতে যা বোঝায় তার সংগ্রহ এ গ্রন্থ নয়। এর অর্থ এই যে, দশ-বারো বছর শামসুর রাহমান যে চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন না, অনেক জল ঘেঁটে জীবনের বয়স বাড়ার মানে বুঝেছেন, এই বই সে কথাই বলে দেয়। প্রকৃতি এবং নারীকেন্দ্রিকতা মুক্ত হয়ে (বর্জন নয়) শামসুর রাহমান 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'র কবিতাগুলিতে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন অনেকটা অমিয় চক্রবর্তীর মতই নিরাসক্ত সচলতা অর্জন করেছেন। এই অগ্রগতি

সম্পর্কে তিনি যে সচেতন তা তাঁর এতদিনকার লেখা কবিতাগুলি থেকে এই বইয়ের জন্য যেভাবে বাছাই করেছেন তাই প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত। আশার কথা এই যে, জনরবে আমাদের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান আধুনিক কবি তাঁর প্রথম বইয়ে জনরবকে হাস্যকর করে তোলেন নি। বরং যাঁরা আদতেই কবিতার কাব্যিয়ানা এবং কোন কোন ন্যক্কারজনক একমুখী আসক্তির প্রতি তীর্যক মনোভাবসম্পন্ন তাঁরাও কাব্যের সুস্থ পটভূমির একটা সম্ভাব্য প্যাটার্ণ সম্পর্কে আশা নিয়ে এই বইয়ের দিকে তাকাতে পারবেন।

আলোচনা শুরু করার আগে একটা ব্যাপারে অবশ্য পরিষ্কার হওয়া দরকার। কথাটা হল, আমি একটু আগেই নিরাসক্ত সচলতা কথাটার পরিপ্রেক্ষিতে শামসুর রাহমানকে অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তুলনা করেছি। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা দু'জন সমগোত্রীয় কিংবা অমিয় চক্রবর্তী এ ক্ষেত্রের পদচারণায় শামসুর রাহমানের অগ্রপথিক। এমন কোন উদ্দেশ্য আমার নয়। 'নিরাসক্ত সচলতা' কথাটায় এই দু'জনের মেজাজের এক দিকে যতটা মেলে ঠিক ততটুকই আমার লক্ষ্য। তার বেশী নয়। তাছাড়া ঐ একটা কথা দিয়ে কোন ব্যক্তিত্বেরই পরিধিকে এঁকে দেওয়া যায় না—দু'টি সক্রিয় ব্যক্তিত্বকে তো নয়-ই। প্রকৃতপক্ষে শামসুর রাহমানের কাব্য-মানস জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব বসুর হাত ধরেই প্রকৃতি ও নারীর রাজ্যে নিমীলিত চোখ মেলেছিল। শামসুর রাহমান তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গী অনুযায়ী স্বতন্ত্র পথ কাটতে পেরেছেন অবশ্য পরে। এ পর্যায়ে তাঁর অগ্রসর প্রচেষ্টায় জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব থেকে যে পৃথক বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায় বাংলা কবিতার বিকাশের ক্ষেত্রে তার অনস্বীকার্য তাৎপর্যও রয়েছে। জীবনানন্দ দাশের মানস আধুনিক অবলোকনশীলতার লক্ষণে সম্পন্ন। তাঁর পরিপার্শ্বের প্রতি অবলোকন-শীল দৃষ্টিপাতে পর্যালোচনার গুণ রয়েছে। তবে তাতে পুরোপুরি আধুনিক যে বৈশিষ্ট্য নিবিষ্টতা তা নেই। তাছাড়া জীবনানন্দ দাশ তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটা নিশ্চিত আশ্রয়ের আশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলেন। এইটে তাঁর নিজস্ব আবিষ্কৃত সত্য। এবং যেহেতু নির্ধারিত লক্ষ্য তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন সে কারণে বিশ্লেষণে তিনি পরাঙমুখ। তাই আধুনিক সংশয় এবং উন্মনা যন্ত্রণা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রতিকতার সঙ্গে তিনি একাত্ম হতে পারেন নি। নিজস্ব অন্তর্লোকে তাই তাঁর বাস্তবতা-নিরপেক্ষ স্বস্তি ছিল। স্পষ্টতই

তাঁর এই আস্থা; এই লক্ষ্য-জ্ঞান, এই স্বস্তি এলিয়টের মত প্রতিক্রিয়াজাত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের গীতি-কবিতার ব্যক্তিগত আস্থাপরায়ণতার সঙ্গেই এ-ক্ষেত্রে তার মিল রয়েছে বেশী। এবং এ-ক্ষেত্রে এক হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীও বটে।

শামসুর রাহমানের কবিতাতেও কতকগুলি নিশ্চিত বিশ্বাস খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত তা জীবনানন্দের মত বাস্তবতা-নিরপেক্ষ নয় এবং দ্বিতীয়ত তা এলিয়টের মত প্রতিক্রিয়া সংক্রান্তও নয়। শামসুর রাহমান তাঁর আস্থার জন্য একাধারে আবহমান কালের কাব্যিক ঐতিহ্য-বোধ এবং বাস্তবতার উপর নির্ভর করেছেন। অথচ এই আস্থা অর্জনের জন্য কাব্যধারণাকে রোমান্টিক দৃষ্টির আলোকে পুনর্জীবিত করতে তাঁকে হয়নি—বরং এর মৌল শক্তির চিরন্তনতার উপর নির্ভরশীলতাই এ ক্ষেত্রে তাঁর উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। বাস্তবতার জটিলতাতেও তিনি বাস্তবতার নির্যাস থেকে প্রতিক্রিয়া অতিক্রান্তির তাৎপর্যকে আহরণ করে নিতে চেয়েছেন। আধুনিক কবিতার বিকাশের অন্তরঙ্গ ধারার পর্যায়ে আমরা এক নৈরাজ্যিক আস্থাহীন বিচলিত মনোভাবের আধিপত্য লক্ষ্য করি। অন্যপক্ষে আধুনিক কবিতার আরেক ধারায় সমাজ-সচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে যে আস্থার সঙ্গে আমরা পরিচিত তাতে সমবায় রীতির প্রাধান্য এত প্রকট যে ওতে গীতি-কবিতার মৌলিক অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিক-চেতনার বিকাশ অব্যাহত হতে পারে না।

শামসুর রাহমান অবশ্যই আধুনিক কবিতার অন্তরঙ্গ ধারার কবি। এ-ক্ষেত্রের বিচলিত, আস্থাহীন আবর্তনে তাঁর এই আত্মনির্ভর সুস্থিরতার এবং আস্থার নিশ্চিততা কাব্যে নতুন এক আস্বাদ ও আশা আনবে বলে মনে হয়। তবে এ-পন্থায় আধুনিক কবিতার মুক্তি ও অগ্রগতি সম্ভব কিনা তাও অবশ্য ভেবে দেখবার মত।

অন্যপক্ষে প্রেমের কবিতায় শামসুর রাহমানের ওপর বুদ্ধদেব বসুর প্রাথমিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছি। এ-ক্ষেত্রেও অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য শামসুর রাহমানকে যে পৃথক মনোভঙ্গীর পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাও একান্তই লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের কবিতায় আসক্তি প্রবল এবং প্রধান। তাঁর বিদ্রোহ জৈবিকবৃত্তির অন্ধ একমুখী আলোড়নে সরব, উচ্চকিত। বাংলা কবিতার নীতি-মোহন পারিবারিক শিক্ষামূলক মান

বজায়ের দায়িত্ব-সচেতন লক্ষ্যকে ভেঙ্গে চুরমার করে বাধ্যবাধকতা-পীড়িত ব্যক্তিমনকে স্বাতন্ত্র্যে, স্বাধীনতায় স্বস্তির শ্বাস ফেলতে দিয়েছিল এ। গণ্ডি-মুক্ত ব্যক্তির আবির্ভাবে আন্তর্জাতিকতার সুর লেগেছিল এর ফলে। ঘরের ছেলে বাড়ীর বেড়া ডিঙ্গাতে শিখেছিল--যুবক তার যৌবনকে সহজে ঘোষণা করতে গুরুজনের ভয়ে মাথা নিচু করার সঙ্কোচ থেকে রেহাই পেয়েছিল। তবে কথা এই যে, বিদ্রোহ বিদ্রোহ-ই। ওতে ভাঙ্গার প্রবণতাই মুখ্য। এই প্রয়োজনীয় ভাঙ্গার কাজ ফুরালে আমরা স্বভাবতই আরো কিছু চাই। সাংগঠনিক কিছু। তখন শুরু হয় কাব্য-আবর্তের নতুন পর্যায়, একই ধারায় দ্বিতীয় পর্যায়। বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের কবিতায় স্পষ্টতঃই ভাঙ্গার কাজটুকু রয়েছে, গড়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি আর এগোন নি। বাংলা কবিতার সুমহান ঐতিহ্য--রবীন্দ্রনাথে যা এক আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছিল—সেই মানবিকতা, সেই মানবিক বৃত্তি যেন জৈবিকবৃত্তির আধুনিক প্রসারকামী আবর্তের তোড়ে প্রেমানুভূতির ক্ষেত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রেম চাই, প্রেমের স্বাভাবিক স্ফূর্তিও চাই—কিন্তু তা মানবিক বৃত্তির সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে নিশ্চিতভাবেই তাতে বিকৃতি ও অন্ধ একমুখীনতা এসে যায়—জীবনের নিগূঢ় পরিপূর্ণ স্বাদ থেকে তা বঞ্চিত হয়। তা অবাস্তবও হয়ে পড়তে বাধ্য। কেননা প্রেম কোন ভুঁইফোঁড়, একান্তই জীবন-বিচ্ছিন্ন কোন অনুভূতি নয়। যাই হোক স্বাধিকারপ্রমত্ত প্রেমের অধিকার-তৃষ্ণা বুদ্ধদেবের হাতেই মিটে গিয়েছিল এবং যখনই এর ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ ও বহু দিনের অভ্যাসে গড়া সঙ্কোচের ক্লেদ এ ঝেড়ে ফেলতে পারল তখনই প্রেমানুভূতির সুস্থ সংস্থিতির প্রশ্ন ও চাহিদাও এসে গেল। শামসুর রাহমান এই চাহিদায় সাড়া দিতে পেরেছেন, এইটে সুখের কথা। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোতে জৈবিকবৃত্তি মানবিকবৃত্তির লাবণ্যে সুষমা পেয়েছে—সুস্থতার পরিণতি পেয়েছে। অর্থাৎ শামসুর রাহমান ত্রিশের যুগের নারী ও প্রকৃতি-চেতনা থেকে এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন—এই কথা আমি বলতে চাই। তবে অবশ্যই আমি একথা বলতে চাই না যে, উপরিউল্লিখিত বাস্তব-সজাগ আস্থায় এবং ভোগধর্মী মানবিকতায় শামসুর রাহমান একক। বস্তুত কোন কবিই ক্রান্তি-সম্ভব মূল্যবোধের সেতু-পথে একা হাঁটেন না। বুদ্ধদেব বসুও বাংলা কবিতায় জৈবিকবৃত্তির পরিবেশনায় একেবারেই আকস্মিক নন। তাঁরও পূর্বসূরী রয়েছে। ঠিক তেমনি উপরিউল্লিখিত অগ্রসরমান

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যে শামসুর রাহমানেরও সহযাত্রী নেই বলা যায় না। তবে 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' বইটিতে বৈশিষ্ট্য দু'টো সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য প্রামাণ্য ভিত্তি পেয়েছে—তুলনামূলকভাবে প্রচেষ্টার এই পরিণতি-মুখীনতাকে সহজে স্বীকার করা যায়।

মনোভঙ্গীতে এই নিশ্চিত দুটি ভিত্তি পেয়ে যাওয়ার ফলে শামসুর রাহমান আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুকে একটা সামগ্রিকতার পটে সংস্থাপন করে লেখার সুবিধা পেয়েছেন। তাই লক্ষণীয় যে, শামসুর রাহমানের অধি-কাংশ কবিতার আঙ্গিক Classical এবং বক্তব্য একক লক্ষ্য-নির্ভর। ফলে বিষযবস্তু প্রস্তাবনায়, উত্থান-পতনে ও পরিণতিতে পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

তবে এ-ক্ষেত্রে আমার কয়েকটি কথা বলবার রয়েছে। তা'হলো এই যে, প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিশের কবিগোষ্ঠীর প্রচেষ্টার ক্ষেত্র থেকে শামসুর রাহমান কিছুটা পথ কেটেছেন একথা সত্য, তবুও মূল্যবোধের মৌলস্বরূপটা কিন্তু ত্রিশের যুগেরই রয়ে গেছে তাঁর ক্ষেত্রেও। ধারণার সেই বলয় থেকে, ত্রিশের জীবন-চেতনার সেই বৃত্ত থেকে তিনি কিন্তু বেরিযে আসেন নি। অবশ্য বাংলা কাব্যে ত্রিশের যুগের এক যুগান্তকারী ভূমিকা ছিল। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তার পরেও সমাজ-চেতনার বিবর্তন হয়েছে। জীবন-চেতনায় সংশোধিত উদ্ভাবনার সূচনা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যচেতনারও পরিবর্তনের, সংশোধনের, সমন্বয়ের, পুনর্গঠনের ও নব-বিন্যাসের প্রয়োজনও অনুভূত হতে শুরু করেছে নিতান্ত যুগীয় ও জাগতিক কারণেই। এ ক্রুসিবিলিটিজের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কবিতাকে যাচাই না করলে ভবিষ্যতের চাড়ার প্রতি সাড়া না দেওয়ারই সামিল হবে বৈ কি।

২

শামসুর রাহমান ডেলিকেট সেন্সের কবি। এ-ক্ষেত্রের প্রধান অসুবিধে এই যে, এমন অনুভূতিপ্রবণতা বড় বেশী ইনিসটিংটিভ এবং কাজে কাজেই ভোগ-বৃত্তিও ইনিসটিংটিভ। এই সহজাত বৃত্তে আপন খুশীতে সহজ উৎসারণের মনোভঙ্গীই প্রধানত সক্রিয়।

কিছু নেই যার বিত্তের কণা
বাজিয়ে সে তাঁর চিত্তের তারে আনে মূর্ছনা

(—যুদ্ধ)

এবং

নোনাধরা মৃত ফ্যাকাশে দেওয়ালে প্রেতছায়া দেখে, আসন্ন
ভোরে দু'টুকরো রুটি
না-পাওয়ার ভয়ে শীতের রাতেও এক-গা ঘুমেই বিবর্ণ হই;
কোন একদিন গাঢ় উল্লাসে ছিঁড়ে খাবে টুঁটি
হয়তো হিংস্র নেকড়ের পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজার খিল
সন্তাসূর্যে যেসাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে শুধু
গড়ি উজ্জ্বল কথার মিছিল।

(—রূপালী স্নান)

মনোভাবের এই মূলকথা নিজের অনুভূতির কাছে এতখানি সৎ যে, এ অনভিপ্রেত পারিপার্শ্বিককে এড়াতে যেসাসের ক্ষমাই শুধু মেখে নেয় না মনে, দরজার খিল তুলে দেয়ারও পক্ষপাতী। কেননা তাঁর লক্ষ্য হল আনন্দ। বিশুদ্ধতম অনুভূতির উপভোগে বিশুদ্ধতম আনন্দ। এর জন্যে কালের অবস্থা বিপর্যয়ে কবি-মন ন্যূনতম দাবির উপর এসে দাঁড়িয়েছে—শুধুমাত্র চিত্তের তারের ওপর নির্ভর করতেও রাজী। কিন্তু এর মধ্যেও ব্যতিক্রম ঘটলে সঙ্কটটা বিপজ্জনক হওয়ারই সমূহ সম্ভাবনা। কারণ তাতে আক্রমণটা ঐ ন্যূনতম ভিত্তির ওপরেই এসে পড়ে—অনুভূতি ও আনন্দের বিশুদ্ধতার মধ্যেই সংক্রমণ ঘটে—বিশুদ্ধতার সীমানা আর থাকে না। তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম:

মনে হয় আমি যেন সেই লোকশ্রুত
ল্যাজারস, তিন দিন ছিলাম কবরে, মৃত—পুনর্জীবনের
মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে।
পোষাকের জেল্লা তবু পারে না লুকাতে কোন মতে
বিকৃত দেহের ক্ষত, লোবানের ঘ্রাণ সহজেই
ডুবে যায় প্রাক্তন শবের গন্ধে; নীল আঙুলের
প্রান্তে বিদ্ধ তিনটি দিনের ক্ষমাহীন অন্ধকার।

ল্যাজারসের পুনর্জীবনে আনন্দিত নন একটুও, বরং এই পুনর্জীবনে যে মৃত্যুর গন্ধ লেগে আছে, তাই মনকে বিস্বাদে ভরে তুলেছে। নিরঙ্কুশ

বিশুদ্ধ আনন্দের অন্বেষায় ব্যতিক্রমকে স্বীকারের, কোন আপসই এখানে অচল। 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্য গ্রন্থে তাই একদিকে অমৃতের আস্বাদনে খোঁজে মিহিন অনুভবের উল্লাস এবং অপরদিকে তার বিপরীত পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে অমৃতে নিদারুণ নীল বিষের সংক্রমণের সচেতনতা মিশে আছে। ঐতিহ্যিক কবি-মন এবং বাস্তবিক লোক-চেতনা একটি মিশ্র-বোধে এই গ্রন্থে সমন্বিত হয়েছে। এবং এ-থেকে ফলে উঠেছে এক ধরনের নিরঙ্কুশ বিশুদ্ধ সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি এবং আশা। এই সম্ভাবনা কাব্যগ্রন্থটির লক্ষ্য কিন্তু সঙ্কট-সচেতনার ডামাডোলে মিশ্রভাবে ফুটে উঠেছে যে অমৃত ও বিষ— তাই হল এর সৃষ্টি। এখানে দ্বৈতভাবে লোক-বুদ্ধি ও কবি-মন সমাজ-সক্রিয়তার একই যজ্ঞশালায় রূপায়িত হয়েছে। রুচির বিপরীত উপাদানকে, সঙ্কটের উপকরণকে শামসুর রাহমান কাব্যবস্তু বলে স্বীকার করেন নি একবারও, কিন্তু তাঁর অজান্তেই এগুলো অমৃতের ফুল না হয়ে বিষের ফুল হয়ে উঠেছে। এবং এগুলো যে সৃষ্টি হিসেবে নগণ্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। যুগীয় মূল্যবোধের হেরফেরে প্রথানিবদ্ধ কবিস্বভাব কী করে যে নতুনের, বিপরীতের কারিগর হয়ে উঠছে, এই গ্রন্থ তার আর একটি চমৎকার নিদর্শন।

শামসুর রাহমানের বিষয়-জগতের পরিধি বিস্তৃত নয় এবং এর সর্বত্রই আবার অনুভূতির বা কাব্যের বিশুদ্ধতা এবং তার বিপরীত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে শৈল্পিক তর্কসঞ্জাত হয়ে আছে। এ-তর্ক অবাস্তব মনে হতে পারে এবং এ-ক্ষেত্রে এ কথাও মনে জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, অহেতুক এ-তর্কে না গিয়ে বাস্তবতাকে সহজে স্বীকার করে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সে যাই হোক, এই তর্কই শামসুর রাহমানের কাব্যের এক অন্যতম উপাদান। এবং সব মিলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে, যেন সমগ্র বইটাই একটি বিশেষ মনোবিন্যাসের পাকাপোক্ত মুখবন্ধ—এমন একটা ভিত্তি, যেখান থেকে একটি শিল্পাদর্শ তার স্থিরীকৃত পথে নিশ্চিত নির্দ্বন্দ্ব পা বাড়াতে পারে। শামসুর রাহমানের অবশ্য দ্বন্দ্ব নেই, তবে বিপরীত সম্পর্কে অতিরিক্ত সজাগতা রয়েছে। আত্মস্থ বিশ্বাসের বিপরীত সত্যকে এত বেশী স্বীকার এবং প্রাধান্য দেওয়া মূল মনোভাবের নিটোল বিকাশের পরিপন্থী কিনা, তাও ভেবে দেখবার মত। সহজাতভাবে বিশুদ্ধতার আর্তি কোন আপসে সন্তুষ্ট হতে পারে না। কিন্তু প্রকারান্তরে শামসুর রাহমান উল্লিখিত মিশ্রণের মধ্যে দুটো অবস্থাকেই যেন পাশাপাশি ধরে রাখতে চেয়েছেন। এতে ঠিক

আপস নেই। তবে অনভিপ্রেতকে প্রবলভাবে অস্বীকার করার জোরও এতে নেই আপাতত। অবশ্য এতে কাব্যে নতুন চেহেরা এসেছে। কিন্তু পরিণতির জন্যে এই পন্থা কতটুকু উপযোগী তাও অবশ্য প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ, কাব্য-পরিণতিতে মনোভঙ্গীর একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুসারী অগ্রসর-মানতা খুবই অভিপ্রেত। এ যদি কেবলই ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাকে, তবে কবি-ব্যক্তিত্বের স্থির নিশ্চিততা ও উদ্‌যোগী স্বভাবের অভাবের কথাই প্রকট হয়ে পড়ে। স্বভাবতই কাব্যের প্রভাবের সামগ্রিক কার্যকারিতাকেই এ স্তিমিত করে দেয় পরিশেষে। কিন্তু এ সম্পূর্ণই ভবিষ্যতের ব্যাপার। শামসুর রাহমানের ভবিষ্যৎ মনোবিকাশই এ প্রশ্নের উত্তর দেবে।

বর্তমান প্রবন্ধে বরং 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্যগ্রন্থের আরো কয়েকটা প্রস্ফুট লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

ডেলিকেট সেন্স মাত্রকেই অনেক সময় রোমাণ্টিক মনে করা হয়। এমন কি চাঁদ-ফুল-পাখী, প্রেম ও প্রকৃতির আমেজী ব্যবহারকেই আমরা রোমাণ্টিক বলে ধরে নেই। এই ধারণা দিয়ে অবশ্য শিল্প বিচার চলে না। কেননা, পৃথিবীর কোন বিষয়ই নিজে থেকে রোমাণ্টিক বা ক্ল্যাসিক নয়। রোমাণ্টিকতা বা ক্ল্যাসিকতা মনোভঙ্গী এবং প্রয়োগ-পদ্ধতির সমন্বয় মাত্র। সেই হিসেবে ডেলিকেট সেন্স মাত্রকেই আমরা রোমাণ্টিক বলে ধরে নিতে পারি নে। যেমন ডিলান টমাসের মিহি মেজাজের আচ্ছন্ন স্বভাবের কবিতা রোমাণ্টিকতাসর্বস্ব নয়। কিন্তু শামসুর রাহমানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে তাঁর ডেলিকেট সেন্স মূলত রোমাণ্টিক গোত্রের। তাঁর রোমাণ্টিক উচ্চাভিলাষী কল্পনার ডানা বাস্তবতার রূঢ় সত্যের সংস্পর্শে এসে বারবারই কাটা পড়েছে। কল্পনার জায়গায় অভিজ্ঞতা স্থান দখল করে নিয়েছে। এতে করে রোমাণ্টিকতার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হতে পারে নি। শামসুর রাহমান অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিরোধের যন্ত্রণায় জ্বলেননি। তিনি উভয় রক্ষা করতে চেয়েছেন--তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ও মনোভাবের তীব্রতাই ক্ষুণ্ন হয়ে পড়েছে। এসব কথা আমি পূর্বেই বলেছি। এখানে আমার বিশেষ কথা এই যে, বর্তমান স্থান-কাল-পাত্র রোমাণ্টিকতার জীবন-রস যোগানোর উপযোগী নয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কাব্য-চেতনা অ্যান্টিরোমাণ্টিক—তা বিশ্লেষণপন্থী, বাস্তবতার তাৎপর্য-অন্বেষায় নিবিষ্ট। এর কল্পনা বাস্তবতা চিত্রণের সহায়ক মাত্র। কিন্তু রোমাণ্টিকতার মূল-মাধ্যমই হল কল্পনা—স্বাধিকার-প্রমত্ত, উন্মুক্ত, মহতের বৃহতের স্বাপ্নিক, উচ্চাভিলাষী, অভিসারী কল্পনা। শামসুর রাহমানের বাস্তবসজাগতা বা অভিজ্ঞতার সূত্র

ধরে তাঁর কাব্যে সমসাময়িকতা, চিন্তা ও জীবন-চিত্রের স্রোত অনুপ্রবেশ করেছে এবং আঙ্গিক ভাষা ও রুচিতে তিনি বাংলা কাব্যের সাম্প্রতিকতম উন্নয়নেরও উত্তরাধিকারী, কিন্তু মনোভঙ্গীর দিক থেকে আধুনিকতার প্রধানতম নিয়ামক যে লক্ষণ—বিশ্লেষণমুখীনতা, তার গোত্রে তিনি পড়েন না। কেননা তাঁর কাব্যে রাহুগ্রস্ত কল্পনাই এখন পর্যন্ত প্রধান নিয়ামক শক্তি। রাহু-অভিজ্ঞতা নয়। এ যেন এক ধরনের রোমান্টিসিজমের ক্ষয়িষ্ণুতার কবিতা। বাংলা কাব্যের এই আপাতবিরোধী অগ্রগতি কাব্যের বিকাশ-মেজাজ সম্পর্কে এক বিচিত্র প্রশ্নকেই তুলে ধরে নাকি।

তা ছাড়া শামসুর রাহমানের রচনা-পদ্ধতি ন্যারেটিভ, বিষয় ও সত্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ বিধৃত করতে প্রয়াসী এবং আয়োজন কেন্দ্রমুখী ও লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠ। এর ফলে কাব্যের ট্র্যাডিশন্যাল আস্বাদ সহজে পাওয়া সম্ভব। তবে এ-ক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন রয়েছে। আধুনিক কাব্যের বিশ্লেষাত্মক পদ্ধতিতে একটি সত্যের উদ্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই একাধিক সত্য সমান্তরালভাবে ভিড় করে আসে। কারণ আধুনিক মন একটি বিশেষ সত্যের নিরঙ্কুশ আদি ও অন্তে এবং তার নিরপেক্ষ পূর্ণাঙ্গ স্বরূপে বিশ্বাসী নয়। তাই আধুনিক কাব্যে এক সত্য আরো অনেক সহজাত সত্যকে আহ্বান করে। এক চিত্র আরো বহু চিত্রের উদ্ভাবনার উৎস খুলে দেয়, এক বিষয়ের প্রস্তাবনা তার এককেই আর সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এর স্বভাবটা Centrifugal—কেন্দ্র থেকে এর শতধা বিচ্ছুরণ। ন্যারেটিভ পদ্ধতি ও কেন্দ্রমুখীন একনিষ্ঠতা এই আধুনিক ব্যতিক্রমের সঙ্গে কতটুকু একাত্ম হতে পারে, তা অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ। বস্তুত উপকরণগুলোর স্বাতন্ত্রশীলতা যেখানে প্রবল ও অনস্বীকার্য, উৎসও যেখানে অনন্য নয়, চিন্তাপ্রণালী যেখানে 'বিচিত্রগামী' এবং পটভূমি যেখানে 'বিপুলা' সেখানে বহুধাবিস্রস্ত 'অনিশ্চের' স্বরূপ সন্ধানে ইংগিত ও আভাষময়তার পদ্ধতিই নানা পন্থা বলে মনে হয়।

আধুনিক কাব্য-বৈশিষ্ট্যের চারিত্র সংগ্রন্থনের এতকাল পরেও এই পদ্ধতি-গত অ্যানাক্রনিজম একটি প্যারাডক্সেরই কৌতূহল উদ্রিক্ত করে নাকি? একি ব্যতিক্রম, না সমন্বয়, না পুনরাবৃত্তিরই নতুন মোড়; না আধুনিক চেহারায় পুরাতনই?

শামসুর রাহমান অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। প্রেম তাঁর শৈল্পিক উৎসারণে সবচেয়ে বড় প্রেরণা: কবিতার প্রতি প্রেম, নারীর প্রতি প্রেম। কবিতার

প্রতি প্রেম a thing of beauty-র প্রতিনিধিত্ব করেছে ; নারীর প্রতি প্রেম জীবনের প্রতি বিমূর্ত ভালবাসা, বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে গ্রথিত ও একাত্ম। এ পর্যায়ে সমাজের অবশ্যই গৌণ হয়ে পড়বার কথা। তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ সমাজ রূপায়ণের সাফল্যই কাব্যের মুক্তির নিয়ন্তা—এ কথার কোন মানে হয় না। কাব্য-সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে কবি-স্বভাবের উপরই—বিষয়ের উপরে নয়। এই উক্তির তাৎপর্যে শামসুর রাহমান যে তাঁর নিজস্ব পরিধিতে, রুচিতে, মনোভঙ্গীতে এবং অভিব্যক্তিতে সফল কবি এতে কোন সন্দেহ নেই। এ সাফল্য তাঁর কাব্যের বৈষয়িক গুরুত্বের তোয়াক্কা না করেই সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠ। তবে এখানে বিশেষ কথা এই যে, শামসুর রাহমানের এই কবি-মন বড় বেশী আত্ম-সজাগ, স্ব-প্রতিভ এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্বভূতেষু। তাঁর ব্যবহৃত কোন উপমাই, কোন চিত্রকলাই শুধু পরিস্ফুটনের উপাদান মাত্র নয়—সর্বদাই কবি নিজে সেখানে সংযোজিত। বলা বাহুল্য, অবস্থা সমাজেরই দান। এই আবর্তনের পরিধি ছোট, কিন্তু বড় গভীর—Short but intense—Keats-এর মতই। একটা সর্বব্যাপ্ত তৃষ্ণা যেন স্তরে স্তরে সঞ্চারিত। এই তৃষ্ণা তীব্র individualism-এর। মূলে সমাজ-সত্তার ব্যাপ্তির দিকে, সার্বজনীনতার দিকে এর আগ্রহ নেই, রুচি নেই। লক্ষণীয় যে, এই স্বভাব উনবিংশ শতাব্দীর মননশীলতারই পরিণতির দ্যোতক। অপর পক্ষে এই পরিণতিকেও পেরিয়ে গ্যেটে তাঁর ফাউস্টের মধ্যে individualism-এর অন্ধ সম্প্রসারণশীলতার যে ক্লান্তি অবলোকন করেছিলেন এবং সমাজ-সত্তার ব্যাপ্তির মধ্যে প্রসারিত হওয়াতে যে শান্তির সম্ভাবনা বিধৃত রয়েছে বলে উপলব্ধি করেছিলেন, তা আজ এক শতাধিক বছর পরে সেই ঋষি-মনের সুদূর ভবিষ্যৎবোধের যথার্থতাকেই প্রতিপন্ন করছে। বিচিত্র অন্তঃস্রোতে বিপর্যস্ত সভ্যতার কাঠগড়ায় দাঁড়ানো স্বাতন্ত্র্য-স্বভাবী কবি-মনের পক্ষে পটভূমির আগাগোড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফলশ্রুতি থেকে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আজকের individual যদি individualism-এর সেই প্রাথমিক আত্মমুগ্ধ প্রবণতাতেই আবর্তিত হয়, তবে individualism-এর এতদিনের বিবর্তন কোন তাৎপর্যই তুলে ধরতে পারবে না। তাহলে বুঝতে হবে তার এত স্তর পার হওয়ার শিক্ষা ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে কোন সমন্বয়ই ইতিমধ্যে গড়ে তোলে নি—সে সমাজের বুকে সেই প্রথম দিনের নতুন চোখ-মেলা বিদ্রোহীই হয়ে রয়ে গেছে, তার চোখে সমাজের ভুল আর একটুও পাল্টায় নি। কিন্তু

ব্যাপার তো তা নয়। সমাজের রূপ ও মূল্যবোধ পাল্টিয়েছে এবং সেই সঙ্গে individual-এর স্বভাব ও স্বরূপও পাল্টিয়েছে। এখনও যদি individual-এর ভোগবৃত্তি বাস্তবতার তাৎপর্য উপলব্ধি করেও, বাস্তবতার সংলগ্নতাকে, ঘনিষ্ঠতাকে অস্বীকার করার দিকেই প্রাণপণে ঝুঁকে থাকে, তা হলে সেই individual তার বর্তমান স্বরূপ ও অস্তিত্বের তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়—এ কথাই দুঃখজনক হলেও ধরে নিতে হবে। এই অসুবিধার জন্যেই শামসুর রাহমান কতকগুলো চিরন্তন পূর্ব-নির্ধারিত মৌলিক সত্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সৃষ্টিমুখীন হয়েছেন। এতে সুস্থিরতা এসেছে সন্দেহ নেই, ফলে তাঁর কাছ থেকে আমরা কাব্যের ঐশ্বর্য পেয়েছি; কিন্তু এই বাধা ঠেলে চেতনার ঐশ্বর্য কতখানি প্রতিফলিত হতে পারে, তা অবশ্যই ভেবে দেখবার মত। কাব্য সব সময়েই বিদ্রোহকে উৎসাহ দেয়। পরিবর্তিত individual নতুন পরিস্থিতি, পটভূমি ও বোধের টানাপোড়েনে নতুন অস্থিরতায় চঞ্চল হয়ে উঠবে—এই অবস্থাই সব সময় কাব্যে নতুন ফসলের জন্ম দেয়। আমার এ-বক্তব্য থেকে আমি অবশ্য এই দাবি করছি না যে, ব্যক্তি-সত্তাকে সমাজ-সত্তায় মিলাতেই হবে। আমি শুধু এটুকু মাত্র বলতে চাই যে, সাম্প্রতিকতার সত্যে ব্যক্তি-সত্তাকে যাচাই ক'রে তার সিদ্ধান্তে পরাঙমুখ হয়ে ঐতিহ্য-বিলাসী বিচ্ছিন্নতাকেই আঁকড়ে থাকলে এতে গলদ এবং দুঃখ দু-ই আছে।

* 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে'—শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্য-গ্রন্থভিত্তিক আলোচনা।

উপান্তের কবি

'উপান্ত' হাবীবুর রহমানের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ। দীর্ঘকাল ধরে তিনি কবিতা লিখছেন। পাঠক-মনে স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁর কবিতা সম্পর্কে কৌতূহল গড়ে ওঠার কথা। সে কারণে তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ হাতে পেয়ে, দেরী হলেও, অনেকেই খুশী হবেন।

হাবীবুর রহমানের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের লেখা থেকেই উপান্তর কবিতাগুলো নির্বাচিত হয়েছে। কবি অবশ্য বইয়ের ভূমিকায় দাবি করেছেন 'উপান্তর কবিতাগুলো সবই হালকা রসের ভিয়েন দেওয়া'। অর্থাৎ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে বিশেষ ধরনের কবিতাগুলোই শুধু এতে সঙ্কলিত হয়েছে—কবি হয়তো ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত উক্ত মন্তব্যে এই ধারণাই সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একথা হয়তো ঠিক নয়। কেননা প্রথমত কবি সাধারণত যা লেখেন এবং যেমন ধরনের লিখে থাকেন, তারই সংগ্রহ এই বই। তাঁর সনেটগুলো এতে যথাযথরূপে প্রতিনিধিত্ব-মূলক হয়ে ওঠে নি, কিন্তু লিরিকের বেলায় এ-ক্ষেত্রে একথা খাটে না। তা'ছাড়া এতে লিরিকের ও গদ্যধর্মী রচনার সংখ্যাই বেশী। দ্বিতীয়ত এতে সন্নিবেশিত রচনাসমূহের মেজাজ নিশ্চিতভাবেই serious. কবি যে উপান্তর কবিতাগুলোর সবই হালকা রসের ভিয়েন দেওয়া বলে দাবি করেছেন—এ-দাবি লক্ষ্য করলে বা কবিতাগুলো নিজে পড়লে মোটেই তা' মেনে নেওয়া সহজ হয় না। তবে হয়তো রচনার দরুন অনেক গুরুতর কবিতাও হালকা হয়ে পড়েছে সেটা অবশ্য অন্য কথা। এই পরিস্থিতিতে কেন উপান্ত প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা সংগ্রহ হিসাবে স্বাভাবিকভাবে পরিবেশিত না হয়ে 'হালকা রসের' বিশেষত্বে চিহ্নিত হলো—এই প্রশ্ন অবশ্যই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং এ-ব্যাপারে কবির প্রকৃত মনোভাব কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও সৃষ্টি না করে পারে না। কবির এই সঙ্কোচ বা

অজুহাত বা একটা যেন আড়াল সৃষ্টির মনোভাব সহজ বা স্বাভাবিক কিনা, এ সংশয় জাগে বলে এই গ্রন্থের স্বাভাবিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টাও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই।

উপান্ততে একত্রিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলোতে সাধারণ-ভাবে কিছু রোমাণ্টিক মনোভাবনা, সামাজিক, সাংসারিক ও ব্যক্তি-চারিত্রগত ধারণা ও অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত আশা-আকাঙক্ষা ও প্রতি-ক্রিয়ার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কবিতাগুলোর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং লক্ষ্যেব দিকে সমগ্র রচনা এমনই একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত যে, কবির শ্রেণী-মনোভাব ও মানসিকতাও এতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হয়ে গেছে। কাব্যে যে পরিশীলন প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার বিস্তৃতিকে অনিবার্য এক ফোঁটা নির্যাসে পরিণত করার যে অপরিহার্যতা কাব্যে আবশ্যক, কবি তার দিকে বড় বেশী মনোযোগ দিতে পাবেন নি বলে মনে হয়। সে কারণে উপাত্তর অধিকাংশ রচনাতেই কাব্যের চাইতে মধ্যবিত্ত মনের প্রতিফলন একাগ্রতাই অধিকতর প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উপাত্তর প্রথম কবিতা 'আটপৌরে'ই উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে কবি ইস্কাটনে বা সিদ্ধেশ্বরীতে কাঠা তিনেক জায়গার বাসনা করেছেন যেখানে তাঁর মুলিবাঁশের ঘর উঠবে এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সংসারের উন্মুক্ত ও মনোমত বিন্যাস ঘটবে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রাণময়তার মধ্যে। পরিশেষে কবির 'আজকের এই ভাড়া করা ইটের কারাগারে আবদ্ধ জীবনে'র একঘেয়েমী থেকে মুক্তির প্রার্থনাই আর্ত দীর্ঘশ্বাসে ফুটে উঠেছে এই কবিতায়। ইস্কাটন বা সিদ্ধেশ্বরীতে মুলিবাঁশের বাড়ী উঠতে পারে কিনা এবং সেখানেও কবি-কল্পিত উন্মুক্ত ও প্রাণবন্ত ও স্পর্শময় এবং অবারিত প্রকৃতি রয়েছে কিনা—সে বাস্তবতার প্রশ্ন এখানে তুলছি না, কবিতার জন্য সেটা আবশ্যক না-ও হতে পারে। কিন্তু এতে অভিব্যক্ত কবির মনোভাব যে কোনক্রমেই হালকা নয় সেটা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য; কিন্তু তাতেও কিছু আসে যায় না। কেননা, কবির দাবি যাই থাকুক না কেন, তাঁর কবিতা শেষ পযন্ত একটি স্বতন্ত্র বস্তুই। সেজন্যে কবির হাত ধরে তাই বিচার কোন দিন গড়ে ওঠে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'আটপৌরে'র seriousness-কে ধরে নিয়ে বিচার করলেও এর বিষয়বস্তু কতখানি কাব্য হয়ে উঠেছে, সেই প্রশ্ন তবুও পরিহার করা যায় বলে মনে হয় না। যে-কোন ভাষা ও কল্পনা-শক্তিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত লোকই এ-বিষয়ে একটি রচনা লিখলে 'আটপৌরে'রই

কাছাকাছি একটা কিছু লিখবেন বলেই আমার ধারণা এবং তাঁরা তাদের সেই রচনাকে কবিতা বলেও দাবি করে বসবেন না---এ বিশ্বাসও আমার রয়েছে। এ-ধরনের আরো কিছু কবিতা উপান্তেতে আছে যেগুলোর কাব্য-বিত্ত খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। তাছাড়া প্রথমত এই ধরনের কবিতাগুলো গদ্যতে রচিত এবং এগুলোর অনেকগুলোতেই ছোট গল্পের মেজাজটাও স্পষ্ট হয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, এ-সবের অধিকাংশের বক্তব্যই গতানুগতিক ও বহু কথিত এবং কোন প্রকারের নিজস্ব অনুপ্রাণনাহীন। কাব্যের বিষয় প্রত্যেক কবির হাতেই নতুন হয়ে ওঠে, এমন কি ভাষাও। তা না হলে সেটা স্বতন্ত্র নয়---এবং সেহেতু কবিতাও নয়। কেননা, প্রত্যেক কবিতাই তার নিজস্ব প্রেক্ষিতে নতুন---সেটা সৃজনী আলেখ্য, সে জন্যে নবজন্মের চাঞ্চল্যে উজ্জ্বল ও সজীব। এটার অভাব থাকলে সে রচনায় পণ্ডশ্রমই হয় মাত্র। কাব্যের দাবি ধোপে টেকে না। অপরপক্ষে, ব্যক্তিক-চারিত্র সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া উদ্‌ঘাটন করতে গিয়েও কবির অভিব্যক্তি শেষ পর্যন্ত একান্ত ব্যক্তিকই রয়ে গেছে, সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। 'পরিচয়' কবিতাটি এ-কথার সমর্থনে উল্লেখ করা যায়। রচনাটি কবির একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার একটি কবিয়ানা করা বর্ণনাতে মাত্র পর্যবসিত হয়েছে। এর বেশী হয়ে উঠতে পারেনি আর। আমার মনে হয়, হাবীবুর রহমান সামাজিক ও ব্যক্তি-গত বক্তব্যের দাবিকে যতটুকু বড় করে স্থান দিয়েছেন, কবিতার দাবিটুকুকে ততটুকু দিতে পারেন নি। হেরফেরটা সেখানেই। সে কারণে তাঁর কবিতার সব কথাই হয়তো বুঝতে পারা যায়; কিন্তু একটা কথাতেও মনটা চমকায় না, উদ্বোধিত হয় না। এতে ব্যবহৃত image-গুলো সম্পর্কেও এ-কথা খাটে, শুধুমাত্র 'দীঘির মত' রোমাণ্টিক কবিতাটির তৃতীয় স্তবকটি ছাড়া। 'দীঘির মত' ও 'একটি পক্ষে'—এই কবিতা দুটোই এই বইয়ের উতরানো কবিতা।

উপান্তেতে অনেক কষ্টসাধ্য মিলের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যাবে। শুধুমাত্র মিলের জন্য বাক্য ও ভাবের যে কি দুরবস্থা হতে পারে তার একটি মাত্র নমুনা তুলে দিচ্ছি :

> তুই বিশ্বেস কর সই
> নইলে রূপ কি নেই আমার, আগুন কি নেই, ওই
> চোখ জুড়ানোর, মোমের মত মন গলানোর মতো—
> হোক্‌না নেওটা কিংবা বিদ্‌ঘুটে বজ্জাত, তবু পুরুষ তো।

ঊর্ণনাভের মত দিনরাত। এই দেহটাকে ঘিরে,

ওরা জাল বোনে। আর ঘুর ঘুর করে সেই জালের চার তীরে।

হাবীবুর রহমানের ভাষায় নমনীয় গুণ নেই। কাব্য সুকুমার শিল্প—সে হিসেবে এঁর ভাষার নমনীয়তা ও ব্যঞ্জনা অপরিহার্য আবশ্যকতা। গভীর কোন উদ্বোধনীমূলক প্রেরণা বা উপলব্ধি হাবীবুর রহমানের কবিতার নিয়ামক নয়—চোখে পড়া বিষয়ের হঠাৎ মনে আসা তাৎপর্যের বাইরে যাওয়ার পরিক্রমে তিনি একান্ত নন—সে জন্যে ভাষার কাব্য-স্বভাব ও কবিগুণ আসার লক্ষণও খুব কমই দেখা দিয়েছে। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, অভ্যাসে আর যাই করা যাক, কবিতা লেখা যায় না। আমাদের কবিরা এ কথাটা স্মরণ রাখলেই ভালো। তাছাড়া নিজস্ব কাব্যাদর্শ না থাকলে কোন কবিরই বিকাশ সম্ভব নয় এবং তাঁর কবি-স্বভাবেরও ভিত্তি অর্জিত হতে পারে না। উপান্তে প্রাপ্তি কি আছে আমি জানি নে, কিন্তু সেই কাব্যাদর্শ যে নেই তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এর অজুহাতই কি 'হালকা রসের ভিয়েন'—তাহলে কাব্যাদর্শ কি আছে, তা জানার জন্যে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

সাংবাদিক কবি

এক কথায় যদি কবিতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হয়, তাহলে হয়তো বলা চলে: কবিতা সচেতন মনের মহত্তম চিন্তার সুসজ্জিত প্রকাশ। এবং স্বতস্পন্দমান কবি-মন সদাসচেতন বলেই কবির স্থান কালের যাত্রার পুরোভাগে। বলাবাহুল্য, এই দায়িত্বচেতনা যেমন অনুভূতির ক্ষেত্রে, তেমনি তার প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা দাবি করে। কবির যে মর্মোদ্‌ঘাটি দৃষ্টি অভিনন্দনীয়, বাহ্যত তাকেই মূল্যবান মনে হয়। নিঃসন্দেহে এর অপরিসীম মূল্য রয়েছে ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে। কিন্তু কোন অনুভূতিই আত্যন্তিক মূল্যে গরীয়ান হয়ে ওঠে না, কেননা তার সুসঙ্গত উপস্থাপনার দিকটাও সপরিমাণেই অপরিহার্য।

কাব্য বিচারের এই বহুকথিত মতটি পুনর্বার মনে পড়লো 'সামান্য ধন' পাঠ শেষ করে।

আবদুল গনি হাজারী সুপরিচিত সাংবাদিক ও কবি এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি সাময়িক পত্রে তাঁর কবিতা প্রকাশ করছেন। 'সামান্য ধন' তাঁর প্রথম কাব্য-সংগ্রহ। দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন বলে প্রথম কাব্যগ্রন্থে কবির পরিচয় স্পষ্ট রেখায় ধরা পড়েছে।

এ পরিচয় নিঃসন্দেহে কবি-মনের। পারিপার্শ্বিক জীবনকে তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়ত্ববোধ আর পাশাপাশি সচ্ছল জীবনের নিঃসঙ্গ উচ্ছৃঙ্খলা কবিকে চকিত করেছে। এবং কবি প্রধানত বর্তমান নাগরিক জীবনের অসঙ্গতি অনুধাবন করে তাঁর কাব্য-বস্তু আহরণ করেছেন। কবি লক্ষ্য করেছেন:

"মধ্যবিত্ত জীবনের সুউচ্চ আশার
সংকীর্ণ কারার এই নোনাধরা পাণ্ডুর প্রাচীরে
দিনে রাতে মাথা খোঁড়ে নির্বোধ বাসনা।" (মধ্যবিত্ত)

এবং এ জন্যই কবি-প্রাণের স্বপ্নসাধ পরাজিত হয় প্রতিনিয়ত। কেননা :

"যন্ত্রে ঘেরা জীবনের কষ্টে পাওয়া দামী অবসরে
যন্ত্রের ভাবনারা তবু জুড়ে বসে এসে
আমারে আবদ্ধ করে রাখে এক বন্দীর মতন" (ঐ)

চালের দাম এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভাই ও বাজারের ওষুধের অভাবের চিন্তায়

"···সার্কাসের মেয়েগুলোকে
মানুষের মত নয়
একদলা জীবিত মাংসের
মেশিন বলে মনে হয়।" (সার্কাসের মেয়েরা)

তাই কবির উক্তি : 'বোল না আমারে এখন বাজারে মুক্তো ছড়াতে।'
(সামান্য ধন)

কবির এই সমাজচেতনা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সমগ্র কবিকর্মটি প্রশংসনীয় হয়ে ওঠার পথে আঙ্গিক-অবহেলা প্রবল বাধার কারণ হয়ে উঠেছে। এবং সেইটেই এ-গ্রন্থ সম্পর্কে প্রধান আপত্তি। কবির ভাববস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতার রসে জারিত হয়ে ওঠেনি, অর্থাৎ প্রায়শই যেন ভাবকে আত্মস্থ করবার প্রয়োজনীয় সময়কে কবি উপেক্ষা করেছেন। মনে হয়, কবি তথ্যচিত্র রচনাতেই অধিক আগ্রহী। এতেও আবার চিত্র রচনার আগ্রহটিই প্রবল—চিত্র সমাপ্ত করার চাইতে। ফলে, কবি-মনের পরিচয় প্রত্যেকটি কবিতাতেই লভ্য হলেও তা সেই সচেতন মনের মহত্তম চিন্তার সুসজ্জিত প্রকাশ হয়ে ওঠে নি। তবু ঐ কবি-মনের পরিচয় এত প্রত্যক্ষ যে, কবিকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

প্রশংসনীয় কবিতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ 'কী চাই', 'রাম সাগর'। কিন্তু এই ভাল কবিতাগুলোর ক্ষেত্রেও রচনা পারিপাট্যের দিকে নিদারুণ মনোযোগ ফুটে উঠেছে। ধরা যাক, রাম সাগর কবিতাটিই। সুন্দর একটি চিত্র শ্রীমণ্ডিত ভাষায় এতে রচিত হয়েছে :

কয়েক শ' বছরের প্রাচীন অরণ্য থেকে
কয়েকটি বুনিয়াদী শাখা
কেন যে ভাঙতে গিয়ে সরে এলো হাত
কেন যে তাকালে তুমি সন্ধ্যার তারার মত করে
দূরের বাঁশির মত মধু হয়ে

এই চিত্রের ঠিক চার পংক্তি পরেই কবিতাটি শেষ হচ্ছে নিম্নোক্ত ভাষায় :

এখনো যখন ফতুল্লার গাছালির
মাথায় খানিক এসে থেমে যায় চাঁদ
এ সন্ধ্যা অশান্ত মনে হয়।

'ফতুল্লার গাছালি' শব্দটা স্বাভাবিকত্ব (naturalism) আনার জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে-বক্তব্যের মধ্যে এই শব্দটি এসেছে তা মোটেই এর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে নি। তদুপরি, আগের চিত্রটির পর এই শব্দ সম্বলিত শেষ চিত্রটিতে রীতিমত হোঁচট খেতে হয়। সঙ্গতি-বোধের এই শিথিলতায় বাধ্য হয়েই বলতে হয় যে, কবির মনের অনুভূতি-গুলো আবেগঘন ও স্পন্দনে প্রগাঢ় হওয়ার আগেই কবি সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে তৎপর হয়েছেন ; ফলে সেগুলোর প্রকাশমূর্তি প্রগাঢ়তা ও ঐকান্তিকতা লাভে অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

অপরপক্ষে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। সেটা হল কবির যে সমাজচেতনা তা কিন্তু উদ্দীপ্ত নয়। কোন সৃজনীবোধ বা জীবনচেতনা এসবের পিছনে কাজ করে নি। প্রধানত কবির দৃষ্টি সাংবাদিক observation-এর। তিনি অবিরত দেখে গেছেন, চোখ খুলে শুধু দেখেই গেছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই দেখাটা cynicism-এ ভারাক্রান্ত। দেখার সঙ্গে কবি-মনের স্পন্দন ও রস এসে যোগ দিলেই তবে সে দেখা কবিতা হয়ে ওঠার প্রাথমিক সুযোগ পায়। এই পটভূমি যদি আগাগোড়া cynicism-এ ভারাক্রান্ত হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই কাব্যের সতেজ ও স্ফূর্তমান ভাবটি রচনা থেকে বিলীন হবে সন্দেহ নেই। তাহলে অনেক কবিতা হওয়ার উপযুক্ত রচনাই শেষ পর্যন্ত কবিতা হয়ে উঠবে না। দুঃখজনক হলেও এইটে সত্য এবং এ-সত্য 'সামান্য-ধনের' ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রয়োগ করতে হল।

'সামান্য ধনের' কবির মনোভঙ্গী আধুনিক কাব্যধারার আওতার বাইরে পড়ে না। কবির একটি বিশ্লেষণপন্থী স্বভাব বইটিতে ছড়িয়ে আছে। বক্তব্য ও রুচিও তাঁর আধুনিক মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট করে। কিন্তু কবি যেন এ-ব্যাপারে বুদ্ধি দিয়ে সচেতন নন। বরঞ্চ তাঁর cynicism-এর ঝোঁকে শেষ কবিতায় আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তিনি ব্যঙ্গও করে বসেছেন। আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য ও abstract বলে যে বদনাম আছে সেই সুযোগ তিনি এখানে নিয়েছেন। আধুনিক কবিতার সপক্ষে এখানে বলার কিছু নেই শুধুমাত্র এইটুকু ছাড়া যে, দায়িত্বজ্ঞানহীন অনেক মন্তব্যই কবিতার

বর্তমান ধারা সম্পর্কে করা হয়, তাতে কাব্য-বোধ এবং কবিতার অগ্রগতির সঙ্গে সামান্য সম্পর্কেরও অভাব ছাড়া আর কিছু প্রতিপন্ন হয় বলে আমি মনে করি না। তবে উল্লিখিত ব্যঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য এই, আধুনিক কবিতা-বিষয়ে বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও আবদুল গনি হাজারী আধুনিক এবং তাঁর কবিতা সহজবোধ্য হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক কবিতার সংজ্ঞার বাইরে তা নয়। এবং তাঁকে অবাক করে দেয়ার মতই এ সংবাদটা যে, সহজবোধ্য হওয়ার সঙ্গে আধুনিক কবিতার কোন বিরোধও নেই। শেষ কবিতায় তিনি 'সংবাদপত্রেই' লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আমরা 'সামান্য ধনের' কবির কাছ থেকে সত্যিকারের 'অসামান্য ধন' আশা করব নিশ্চয়ই।

বইটির অজস্র মুদ্রণ-প্রমাদ পীড়াদায়ক। প্রচ্ছদপটের অতি আধুনিক কাগজ-কাটা ডিজাইনের সঙ্গে লোকচিত্রের পাখী খাপ খেয়েছে কিনা প্রশ্ন-সাপেক্ষ।*

* আবদুল গনি হাজারীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সামান্য ধন' অবলম্বনে লিখিত।

দুটো পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

সাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসের উঠতি যুগের ইতিহাসটাই বোধকরি সবচেয়ে কৌতূহলের। সেখানে সব দেখা, সব বলা, সব প্রচেষ্টাই নতুন। ভুল-ত্রুটি, শোধরানো, উদ্ভাবন, সংযোজন সব মিলে নতুন ঘরের গড়ে তোলার আমোদ সেখানে রয়েছে। শিশুর হাঁটি হাঁটি পা পা যেমন উপভোগের তেমন আর কি। আমাদের পূর্ব-বাংলার উঠতি উপন্যাস সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও বাংলা সাহিত্যের সম্পন্ন উপন্যাস-ঐতিহ্য এর বড় বেশী সহায়ক, তবু নিজের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে শুরু করবার বেলায় এ কিন্তু সূচনার নবিশী যুগটা লাফিয়ে পার হতে পারে নি। একে আমি দৈন্য বলব না, কেননা, সেটা বলার বা না-বলার সময় এখনো আসে নি। এখানে আমার কথা এই যে, পূর্ব-বাংলার উপন্যাস হাঁটি হাঁটি পা পা-এর যুগ এখনো ছাড়ায় নি এবং এ মন্তব্যের মধ্যে সব উপন্যাসই পড়ে তা লাল সালুই বলুন কি সূর্য দীঘল বাড়ী কিংবা জননী বা কাশবনের কন্যা ও কাঞ্চনমালা, এমনকি আর একটু এগিয়ে গিয়ে এক মহিলার ছবি বা তেইশ নম্বর তৈলচিত্র। এই অবস্থার কারণটা অবশ্যি কিছুটা বনিয়াদগত, কিছুটা পাঠকের রসবোধ সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ধারণাগত এবং কিছুটা লেখকের বর্ধিত শিল্পচেতনা আর বাস্তবতার অসামঞ্জস্যতার দরুন দ্বন্দ্বগত। আর এই সমস্ত জটিলতার উৎসটাই হল সূচনাগত। সূচনার এই কমপ্লেক্স থেকে মুক্তি পেলে উপন্যাস-শিল্প শিল্পীর স্ব-তান্ত্রিক স্বাধীন সৃষ্টিধারায় অবশ্যিই অব্যাহত হতে পারে—এ আশা নিশ্চিতভাবেই করা যায়।

আমরা সেই আশায় আছি এবং এরই রূপায়ণ পথে উপন্যাসের প্রকাশমাত্রই যে অভিনন্দনযোগ্য এ-কথা দ্বিধাশূন্য চিত্তে ঘোষণা করতেও আমাদের কিছুমাত্র বাধা নেই। এ পর্যায়ে সংযোজন মাত্রই বাঞ্ছিত পরিণতির সাফল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে, চাঞ্চল্য জাগায়, আর তা

যদি পরিণতির রায় না-ও পায় তাতেও আসে যায় না কিছু। কেননা, গঠনের সিঁড়ির মর্যাদা থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না।

সাম্প্রতিক সংযোজনের মধ্যে দুটো উপন্যাস আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সমালোচনার জন্যে। বই দুটো হলো আবদুর রাজ্জাক লিখিত 'কন্যাকুমারী' এবং রশীদ করিম লিখিত 'উত্তম পুরুষ'। কন্যাকুমারী একটি বিপর্যস্ত তরুণীর এক স্তরের জীবন সাফল্যের কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে—প্রেমের স্বীকৃতিতে এবং বিবাহে এর পরিণতি। আর উত্তম পুরুষ হলো একটি তরুণের উঠতি বয়সের প্রতিফলনমূলক ঘটনালেখ্য। উপন্যাস দুটোর প্রধান গুণ এই যে, দুটোতেই গল্প আছে। গল্পের গতি-প্রবাহ আছে। তবে এই সঙ্গে যে বলবার কথা উপন্যাস দুটোকে প্রভাবিত করেছে, তাই বস্তুতপক্ষে এদের সমসাময়িক প্রকৃতি নির্ধারণের মূল উপকরণ। কন্যাকুমারী এবং উত্তম পুরুষে যে বিষয়টি সাধারণ এবং যা বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় তা হলো পটভূমির পরিচয়। প্রথমটির নায়িকা এবং দ্বিতীয়টির নায়কের পটভূমির ভূমিকা উপন্যাস দুটোতে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। কারণটা সামন্তবাদী মনোভাব। ইনডিভি-জুয়াল সম্পূর্ণ পরিণত হলে তার পটভূমিকে আর পরিচয়-পত্রের দায়িত্ব চাপিয়ে জাহির করাতে হয় না—চরিত্রের জন্যে বিশেষভাবে এর কোনো প্রয়োজনও থাকে না, না থাকে লেখকের এর জন্যে কোন মোহ। পরিণত ইনডিভিজুয়াল, পরিণত সমাজ এবং সংস্থিত উপন্যাস-শিল্পে বংশ পটভূমি কোন ক্রাইটেরিয়ান নয়। কিন্তু এর প্রবণতাশীল সংক্রমণ লেখক ও সমাজের সমন্বিত মানসে সামন্ত যুগীয় প্রভাবের সক্রিয়তাই স্পষ্ট করে তোলে। এইদিক থেকে এই লক্ষণ উপন্যাস দু'টো যে সূচনা পর্বের যুগ অতিক্রম করে যেতে পারে নি, এই সত্যটাই প্রতিপন্ন করে। তবে কন্যাকুমারীর লক্ষ্য সীমিত, পরিণতি-প্রবণতা ছোট গল্পের মত একমুখীন (এ-ক্ষেত্রে বিবাহের দিকে) এবং এর উপন্যাসের লক্ষণগুলো প্রসারিত হয়েছে নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্রসমূহের প্রতি সেণ্টিমেণ্ট কেন্দ্র করে এবং বংশভিত্তিক সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতাকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যে। তাতেও আবার বংশ-ভিত্তিক সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণটি গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আর কার্যকর নয়। এতে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই ঘটেছে। প্রথমত গল্পের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সংলগ্ন নয়, এমন একটি উপকরণ থেকে মুক্ত হয়ে গল্পটি সচ্ছল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই সচ্ছলতা কেবলই গল্পের সচ্ছলতা, উপন্যাসের

নয়। দ্বিতীয়ত, গল্প মনোটনী মুক্ত হলো বটে, কিন্তু উপন্যাসের অন্য নতুন কোনো লক্ষণের উদ্ভব তো হলই না, বরং তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ যা একটা ছিল, তারও তিরোধানে এর উপন্যাস-চারিত্র্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। অনুপযুক্ত উপকরণের ওপর নির্ভর করার বিপদটা এখানেই। অন্যপক্ষে, উত্তম পুরুষের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা এ্যামবিশাস্ এবং এর বিস্তারও উপন্যাসেরই, সন্দেহ নেই। এর জন্যে যার ওপর বিশেষ করে নির্ভর করা হয়েছে তা' হলো, নায়কের পটভূমি পরিচয় এবং নায়কের কিশোর জীবনের বিভিন্ন প্রতিফলনমূলক ঘটনাবলী। পটভূমি পরিচয় বংশগৌরবের প্রচ্ছন্ন অহমিকায় আক্রান্ত এবং আগাগোড়া উত্থান-পতনহীনভাবে একই প্রবণতায় প্রকট এবং সেজন্যে মনোটনাস এবং অনেকাংশেই তাৎপর্যহীন। বিশেষ করে যে মনোভঙ্গী উত্তম পুরুষের সকল বিবৃতির পেছনে কাজ করেছে তাকে আর যাই বলা যাক, পরিণত মনোভাব বলা যায় কিনা, সন্দেহ। কিশোর জীবনের ঘটনা সমাবেশে বয়স বাড়ার ইতিবৃত্তটাকে বিধৃত করাই লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার পরিচয় যদি সেলিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে গভীর রাত্রে তার ঘরে প্রবেশের উত্তেজনা কিংবা শিরীন ভাবীর হাব-ভাবকে ভুল বুঝে তার বিছানায় উঠে বসে হাত চেপে ধরার সাহস মাত্র হয়, তবে আমার বলবার কিছু নেই। আর বয়স বাড়া যদি মনের পরিণতিরই আভাস বুঝায় তাহলে দুঃখজনক হলেও এ-কথা বলতে হয় যে, সেটা উত্তম পুরুষে তেমন স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে পূর্বলেখ হিসেবে প্রথম অধ্যায়ে সচেতন উল্লেখে যা বলা হয়েছে তা' ছেলেমানুষী ভাবালুতা ছাড়া আর কী। তাছাড়া আত্মবিশ্বাসের উত্তেজনায় ফুটবল ও ক্যারাম খেলায় জেতা, এমনকি মুসলিম লীগের স্বপক্ষে তর্কে জেতার বিবরণেও যে ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে তা' বৃহত্তর তাৎপর্য পায় নি। তা কিশোর মনের কৃতিত্ব প্রকাশের উল্লাসকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে বলেও মনে হয় না। ফলে, একটি এ্যামবিশাস পরিকল্পনা একটি কিশোর মানসিকতায় উৎসারিত হয়েছে, বড় কিছু সৃষ্টির চাঞ্চল্য প্রথমাবধিই কিশোরসুলভ চাঞ্চল্যের আবর্তে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। লেখক এখানে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন নি, তিনি নিজেই নায়কের কিশোর মানসিকতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন বলে মনে হয়। বিপত্তিটা এই জন্যেই কতকটা। ফলে উত্তম পুরুষ তার উদ্দিষ্ট সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয় নি বলে ধরা যায়।

তবু উত্তম পুরুষ কন্যাকুমারীর চাইতে আধুনিক। কন্যাকুমারী একাধারে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স এবং শরৎচন্দ্রের সেণ্টিমেণ্টের সমন্বিত আধার। এর বাস্তবতার জগতে আকস্মিকতা এক নিয়ামক উপকরণ এবং লেখক তা সযত্নে লালন করেছেন---সমস্ত ঘটনার গতি এই আকস্মিকতার মুখে উদ্বাহু হয়ে ছুটে এসে থুবড়ে পড়েছে---যেখানে নায়ক আর নায়িকা মুখোমুখি হলেন। অথচ অবস্থাটা এমন যে, নায়ক তার ছেলেবেলার প্রিয়াকে হারিয়ে সারা-জীবন তাকেই ভালবেসে খুঁজে ফিরছেন। কিন্তু তাঁকে সামনে পেয়ে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটবার আগে চিনতেও পারছেন না। অবশ্য নায়িকা তাঁকে প্রথম দেখাতেই চিনেছিলেন এবং তা' গোপন রাখাটাই একমাত্র কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। এ-এক অবিশ্বাস্যসম্ভবের প্রশ্নাতীত ক্ষেত্র। অন্যপক্ষে এর প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই সেণ্টিমেণ্টের রসে ফাঁপিয়ে তোলা। নায়িকা তো সর্বগুণে গুণান্বিতা---একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রাইজ পাওয়া পেইণ্টার এবং দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সেতার বাজিয়ে। তদুপরি এর শেষটা একেবারেই সিনেমা-ফিনিশ। গল্পের এই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের যোগটা এখনো গভীর বলে কন্যাকুমারীর গল্পাংশের আকর্ষণ গভীর। বিশেষ করে কন্যাকুমারীর ভাষায় শরৎচন্দ্রের ধাঁচ অনুসৃত। ফলে, এ পাঠকের মনকে চরিত্রের ও গল্পের ভেতরে টানে। অন্যপক্ষে উত্তম পুরুষের ভাষা বিবরণের চাইতে বেশী দায়িত্ব নেয় না বলে এ দু'একটা চরিত্রের ক্ষেত্র (মা ও শিরীন ভাবী) ছাড়া আর কোথাও পাঠকের দূরত্বকে কমিয়ে আনতে পেরেছে বলে মনে হয় না। উত্তম পুরুষ পূর্বলেখে নিজেকে আত্মকেন্দ্রিক বলে মন্তব্য করেছেন। এবং সত্যিসত্যি এই আত্মকেন্দ্রিকতা উপন্যাসের আঙ্গিক ও ব্যঞ্জনাতে সংক্রমিত হয়েছে। ফলে পাঠকের ইনডি-ফারেন্স কাটিয়ে তাকে আগ্রহী করার আহ্বানটা যেন সহজাতভাবেই এতে নেই। শিল্পের কম্যুনিকেশন (যা একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য) এ-যে খুবই বিপত্তি সৃষ্টি করে এতে কোনো সন্দেহ নাই। এই পরিস্থিতির উৎসে কি মনোভাব রয়েছে তা' আর আমি এখানে বিশ্লেষণ করতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা এই যে, উপন্যাস দু'টোর লেখক সম্পর্কে আমি আশাবাদী। তার কারণ সংক্ষিপ্ত এবং তা' এই যে, ঔপন্যাসিক দু'জনই আত্মবিশ্বাসী। তাঁদের ভুলত্রুটি, মানসিকতা যা-ই থাক, সৃজনশিল্পী হিসেবে দুজনেরই নিজস্ব কনভিকশন আছে, সাফল্যের পথ খোঁজার প্রয়াসে যার ভূমিকা কোন অবস্থাতেই গৌণ করা যায় না। তা'ছাড়া উপন্যাসের জন্যে মূলগত

ভাবে যা প্রয়োজন, সেই স্মৃতি-সক্রিয়তার গুণ দু'জন ঔপন্যাসিকেরই রয়েছে। তবে উত্তম-পুরুষে এই স্মৃতি অভিব্যক্ত হয়েছে অপরিণত মনের প্রতিফলনে, আর কন্যাকুমারীতে মনের বিশেষভাবে গঠিত ধাঁচে। যাকে ভাবালুতা বলা হয় এবং যা বাংলা উপন্যাসে ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, মনোভঙ্গীর এই ধরনগুলো সংশোধনসাপেক্ষ।

একটি উচ্চাভিলাষী উপন্যাস

চাঁদের অমাবস্যা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একটি উচ্চাভিলাষী উপন্যাস। অত্যাধুনিক উপন্যাসের মত একটি থিমেই এতে তিনি নিবিষ্ট রয়েছেন। বিস্তারণ নয়, সেই একক থিমেই সমস্ত আলোড়ন ও উদ্ভাবনা কেন্দ্রীভূত করাই এর লক্ষ্য। ফলে উপন্যাসের পূর্বতন সংজ্ঞা থেকে সরে এসে, উপন্যাসের নব উত্তরিত সংজ্ঞায় এ-গ্রন্থ নিজেকে সন্নিবেশিত করার প্রয়াসী। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই স্যামুয়েল বেকেটের 'ম্যালোন ডাইস' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে যায়।

চাঁদের অমাবস্যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ বাস্তব-অবাস্তব, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, সুপ্তি-জাগরণ, সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য, মানসিক সঞ্চরণ-শিহরণ ও শিথিলতা এবং চেতন-অচেতনকে একটি সামান্য সূক্ষ্ম সুতোর এপার-ওপারে রেখে অবলীলায় পারাপার করতে চেয়েছেন। অত্যাধুনিক সাহিত্য তরঙ্গের ধারণামত মানব-মন ও জীবনকে পূর্ণতর করে জানার এইটেই শ্রেয়তর ও নতুনতর আঙ্গিক ও বীক্ষণ বলে তাঁরও ধারণা, অন্তত: এ-গ্রন্থ সে কথাই বলে।

একটি যুবতী নারীকে এক কামবশ আত্ম-আবরণকারী আধা-দরবেশ ঘটনার অলঙ্ঘ্য চক্রে হত্যা করেছে, এই হল গল্পের মূলসূত্র। জিঘাংসা নয়, অন্য কোনো জটিলতাও নয়, সঙ্গম-মুহূর্তে অকস্মাৎ অন্য জনের আবির্ভাবের শঙ্কায় আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত হয়ে খানদানী পরিবারের বহুকালের সাত্ত্বিকতার সাধু-সুনাম নষ্ট হওয়ার ভয় সেই আধা-দরবেশ সংগোপন কামুককে অতর্কিতে মুহ্যমান ক'বে সেই দেহদানরতা আপ্লুতা নারীর কণ্ঠ চেপে ধরতে তার অজানতেই তাকে নিয়োজিত করেছিল এবং ফলে এক অবশ্যম্ভাবী বিপরীত ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল, মৃত্যু। এ-ঘটনার ব্যাখ্যা ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে উপন্যাসে মূর্ত করা হয় নি। এক কৌতূহলপর গৃহশিক্ষক যুবক আধা-দরবেশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের হাত-

ছানিতে মন্ত্রমুগ্ধ চেতনায় তাকে অনুসরণ করতে গিয়েই এই ঘটনার ছায়াতলে উপনীত হয়েছিল। প্রত্যক্ষ সে কিছুই দেখে নি। দেখেছিল মাত্র অর্ধ উলঙ্গ মৃত নারীর যুবতী-দেহকে। তারপরেই সে অদূরে সেই আধা-দরবেশকে আচ্ছন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। সে হত্যা দেখে নি, হত্যাকারীও দেখে নি। শুধু এই হত্যামূলক ঘটনার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরেই ঘটনার সমস্ত অনুরণন যুবক শিক্ষকের অবচেতনে চলে গেছে। জিজ্ঞাসা ও সন্ধানের আলোড়ন, হত্যাকারী কে, এই উদগ্র প্রশ্নের মীমাংসার আত্মক্ষয়িত সঞ্চরণ, সিদ্ধান্ত, আত্মসমীক্ষা ইত্যাদি বিষয় যুবক-শিক্ষকের মনে যুক্তি-তর্কে, হত্যা-কাহিনীর স্বকপোল-কল্পিত পটভূমিতে, হতাশা-নৈরাশ্যে, আদর্শে-নৈরাজ্যে, উদ্যোগে-নিষ্ক্রিয়তায় আবর্তিত হয়ে উপন্যাসটির সামগ্রিক উপকরণে পরিণত হয়েছে। এক পরোক্ষ হত্যাকে কেন্দ্র করে একটি জীবন প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ স্বরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্টতায়, নির্দিষ্ট ও আত্মঅতিক্রমকারী দুর্নিরীক্ষতায় ব্যক্ত হয়েছে। লেখকের উপজীব্যও এইটেই। গল্পে সামাজিক বাস্তবতা মাত্র এইটুকুই যে, যুবক-শিক্ষক যখন হত্যাকারী কে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে মানবিক কর্তব্যবোধে তা প্রকাশ করে দিল, তখনই সেই প্রভাবশালী ঐতিহ্যবাহী সাধু পরিবারের কারসাজিতে তাকেই হত্যাকারীর দায় অনন্যোপায় হয়ে হতবাক হয়ে মানতে হয়েছে, অপ্রতিরুদ্ধ পরিবেশের চাপে। যে পারিবারিক সুনামভ্রষ্ট হওয়ার ভয় একটি কামোন্মত্ত মুহূর্তকে হত্যার মুহূর্তে পরিবর্তিত করে, সেই চরম রক্ষণশীল ভয়ই আর একটি নির্দোষ মৃত্যুর অনিবার্যতাকে ঘনিয়ে তুলতেও পিছ-পা হয় না।

গল্পের শেষে এই সামাজিক বক্তব্যটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং তা ঘটনার পরিণাম হিসেবে পরিণত। এই পরিণাম ঘোষণা লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। আসলে তার মূল অভিনিবেশ যুবক-শিক্ষকের আত্মপরিক্রমা—মানব-মনের স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ আর মানবিক সীমিত বুদ্ধিগত উদ্বেগ, সময় ও প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত সত্তার অলক্ষ্য সঞ্চার ও উদ্বেগ আবিষ্কার প্রয়াসে। এই প্রবর্তনা গূঢ় এবং এই প্রয়াস উচ্চাভিলাষী সন্দেহ নেই। এ উদ্বেগ নিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসের নব পরিগৃহীত অভিযাত্রার সঙ্গী হয়েছেন, এ-কথা স্বীকার করতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর প্রকরণে সার্থক হয়েছেন কি না। উপন্যাসটির প্রধান দোষ বোধ করি এই যে, এ পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে না। গল্পের সঙ্গে পাঠকের রসগ্রাহিতাকে সংলগ্ন করতে পারে না। যুবক-শিক্ষক যেমন এর ঘটনা-সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপিত, তেমনি পাঠককেও সমগ্র উপন্যাসের সংবর্ত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। উপন্যাসের এক প্রধান গুণ এই যে, এ তার বিকাশের সঙ্গে পাঠককেও অংশ গ্রহণ করায়। কিন্তু এ গ্রন্থের আঙ্গিক যুবক-শিক্ষকের মানসিক প্রতিফলনের মাধ্যমে কিছুটা জ্যামিতিক, কিছুটা প্রাবন্ধিক আকার নিয়েছে বলে এর পূর্বাপর আবহের গ্রন্থিটা সর্বত্রই যেন যুবক-শিক্ষকের হাতে বাঁধা। প্রবন্ধে যেমন প্রবন্ধকারই এককভাবে প্রবক্তা, সমস্ত বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্য নায়ক, এতেও তেমনি যুবক-শিক্ষকের আলোড়নই স্বয়ংসম্পূর্ন, তার মধ্যেই সব কিছু সীমাবদ্ধ। ফলে এর উদ্ভাবনা সম্প্রসারিত হয় নি।

চাঁদের অমাবস্যার আস্বাদ তাই সামগ্রিক গল্পের নয়, এর বিকাশ ও পরিণতিতে নয়—যুবক-শিক্ষকের মনের অভিনব প্রতিফলনের কোথাও কোথাও, কখনো বা কোনো ছত্রের বিদ্যুৎচমকিত বহিঃপ্রকাশে ও জীবন-অভিজ্ঞতার চমৎকৃত উদ্ঘাটনে। সেজন্যই উপন্যাসগত ঘাটতি পরিপূরণে যেন পরিচ্ছদ বিভাগগুলো নাটকীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ করে বিভক্ত ও উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে দায় শোধরানো গেছে কি না সন্দেহ। কেননা, এক মৌলিক আবশ্যকতার অনুপস্থিতি রচনা-রীতিতে গরিমা সঞ্চারের সাহায্যে উতরিয়ে নিতে গিয়ে যে যান্ত্রিকতার উদ্ভব ঘটেছে, তা বিষয় ও প্রকাশের সোনায় সোহাগা মিলনের অভাবকে তো ঢাকতে পারেই নি, বরং তা আরো প্রকট করে তুলেছে। গতিহীন এক স্টক গল্প এবং বহু-চর্চিত পুরাতন বক্তব্যের সঙ্গে এতে করে অত্যাধুনিক উপজীব্য মনের আপেক্ষিকতা ও তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্তারের ঝালর-সর্বস্ব চমক আরো প্রকটতর সংঘর্ষে উপনীত হয়েছে। ফলে রচনাটির সাংগঠনিক পরিকল্পনার আগাগোড়া একটা কাঁচা ভিত্তি এতে যেন স্পষ্টতর হয়ে পড়েছে। প্রকরণে ও বিশ্লেষণে অত্যাধুনিক, কিন্তু বিষয় উপস্থাপনে অত্যন্ত গ্রামীণ ও প্রাচীন উপকরণে নির্ভরশীল হয়েছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ চাঁদের অমাবস্যা গ্রন্থে। এর দরুন এ-ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পীমন এবং তাঁর পরিণত বক্তব্য যথার্থ উপজীব্যে সমন্বিত হতে পারে নি বলেই মনে হয়।

উপন্যাস আঙ্গিকপ্রধান বা বিষয়প্রধান যাই হোক না কেন, সেটা বড় কথা নয়। আঙ্গিক বা বিষয় যেটার ওপরই লেখক জোর দেন না কেন, তাতে কি তাৎপর্য ফুটে ওঠে, সেটাই হল বড় কথা। মনে হয়, চাঁদের অমাবস্যার উন্নততর প্রকরণ প্রথা-মাফিক প্রয়োগ করতে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ-গ্রন্থে অপরিহার্য তাৎপর্য বিন্যাসের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। এ-প্রকরণের উল্লাস ও আবেগ বহন করার উপযোগী যথাযথ বিদগ্ধ উপকরণ ও মননশীল ব্যক্তিত্ব তিনি বাছাই করেন নি বলে যেন সমস্ত চাপটা অপাত্রে বর্তেছে বলে ধারণা হয়। যদিও যুবক-শিক্ষককে এ-পদ্ধতির শর্ত অনুযায়ী কিছুটা বানিয়ে নিতে তিনি সচেতন প্রযাস পেয়েছেন। ফলে, এতে উদ্‌ভাবনী ও রচনা ক্ষেত্রে লেখকের শৈলীশক্তির আভাস থাকা সত্ত্বেও ফলিত সম্ভারটি উপাদেয় হয়ে ওঠে নি, আগ্রহ ও আস্বাদের বস্তুও হয়ে উঠতে পারে নি এর রসসত্তা।

তবু, আমাদের সাহিত্যে নতুনতর অভিনিবেশে উদ্যমশীল হওয়ার প্রেরণার সূচনা করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ-গ্রন্থের জন্যে ধন্যবাদার্হ হবেন।

প্রাচ্যের রহস্য নগরী ঢাকা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়। সে সময়ে মোগল আমলের বৃহত্তর বাংলার রাজধানী ঢাকা নতুনভাবে গুরুত্ব অর্জন করে। বঙ্গভঙ্গের পর আসাম এবং পর্ব-বাংলা নিয়ে যে স্বতন্ত্র প্রদেশ গড়া হলো, তার রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায়। এর ফলে বৃটিশ আমলের শুরু থেকে এতদিন পর্যন্ত অবহেলিত পূর্ব-বাংলা ও আসামের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা যেমন উন্মোচিত হলো, তেমনি ঢাকাও এর প্রাচীন ঐতিহ্যের পটভূমিতে নব জাগরণের সাড়ায় বাঞ্ছিত বিকাশের সুযোগ পেল।

ব্রাডলী বার্ট এ সময়ে সম্ভবত নয়া বাংলার কোন জেলা-অধিপতি ছিলেন। আশ্চর্য নিরপেক্ষ মন নিয়ে তিনি পূর্ব-বাংলার পাঠান-মোগল যুগ থেকে বৃটিশ আমল পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এ-অঞ্চলের স্থাপত্য বিশ্লেষণ করেছেন, কিংবদন্তী পর্যালোচনা করেছেন, সাংস্কৃতিক বিকাশের মিশ্রণ ও স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি বিচার করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই এক মহান জাতি ও ইতিহাসের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। পূর্ব-বাংলার প্রকৃতি ও অতীত প্রাচুর্য সম্পর্কে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ মিশ্রিত করে যে আলেখ্য গড়েছেন, তাতেও রয়েছে তাঁর মুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ মনের প্রকাশ।

এমন সহৃদয়তা ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ এ গ্রন্থটিকে একটি অনুপ্রাণিত রচনায় পরিণত করেছে এবং এর অনুবাদও মূল রচনার মতই অনুপ্রাণনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, বলতে দ্বিধা নেই।

গ্রন্থটি উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। কবি, বাস্তবদ্রষ্টা এবং ইতিহাস-বিদের সমন্বয় ঘটেছে এতে। সে সঙ্গে রয়েছে সমাজ ও আর্থিক কাঠামোর উত্থান-পতন বিশ্লেষণ। অনুবাদে মূল লেখার সমস্ত গুণই রক্ষিত হয়েছে

বলে মনে হয়। বস্তুত এমন সাবলীল ও উদ্বুদ্ধ অনুবাদ সহজে চোখে পড়ে না। অনুবাদক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থটির ভাষান্তর করেছেন এবং মূল গ্রন্থের অনুরণন ও তাৎপর্য সর্বার্থে বাংলা রূপান্তরণে সঞ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছেন—এ প্রশংসা না করলে অহেতুক কৃপণতা হবে।

কিছু উদাহরণ দিলে এ উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ মিলবে বলে মনে করি।

১। উপরে মৃত নীল আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ মিট্‌মিট্ করছে। নীচে প্রবহমানা বিশালকায় নদীতে তরঙ্গের নর্তন। নীচের প্রতিটি মুদ্রায় সারা রাত ধরে ক্ষীয়মাণ চাঁদের রূপালী আলো প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নদীর উভয় তীরে কালো পাড়ের মত দেখায়। দুই পাড়ের মধ্যবর্তী স্থানটিতে যেন আলোর চুমকি বসানো। দূরে, নদীতে ও স্থলভাগে একটা অস্পষ্ট সাদা কুয়াশার আস্তরণ ঘুমন্ত পৃথিবীতে ঘুমের জামার মত লেগে আছে।

নদীতে যান চলাচল বন্ধ। গুঞ্জরণে মুখর বাজার স্তব্ধ, নীরব। চরাচরে সর্বব্যাপ্ত এক মহান নীরবতা---মহাশান্তি।

বাধাবন্ধনহীন নদী মুক্তির আনন্দে নেচে-নেচে হেসে-হেসে পালিয়ে যাচ্ছে। মায়ের কণ্ঠে মিষ্টি ঘুমপাড়ানী গানের মত রাত্রির নৈশব্দকে মুখর করে তোলে অফুরন্ত অবিশ্রান্ত কল্লোল সংগীত—এই পৃথিবীটাকে তারা যেন ঘুম পাড়াচেছ।

২। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেব মত পূর্ব-বাংলায় প্রাথমিক যুগও রহস্যের দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠনে আবৃত। মুসলিম অভিযানের পূর্ববর্তী সময়ের যা কিছু জানা যায়, তা উপাখ্যান ও লোক-কাহিনীমাত্র। মুসলমানদের আগে এদেশে বৌদ্ধ এবং হিন্দুরা বাস করতো। তারা ইতিহাস লিখতে জানতো না। বংশপঞ্জী সংকলনের মধ্যে তাদের সাহিত্য-নৈপুণ্য সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। দেশের স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তারা লিপিবদ্ধ করতো না। তাদের জীবনধারণের পথ ছিল এত বন্ধুর এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তাদের নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে থাকতে হতো। এরূপ অবস্থায় সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনার মতো নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহ ও প্রেরণাবোধের কোন অবকাশই ছিল না। জীবন যেখানে এতো সংকট ও সংশয়ক্ষুব্ধ সেখানে দেশের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখার মত সময় কোথায়?

৩। বিশ্বাস হবে না যে, এখানেও এককালে রাজ-রাজড়া বাদশা-সুলতানের রাজধানী ছিল। সোনারগাঁয়ে গেলে দেখা যাবে শুধু সুন্দর শস্যক্ষেত আর ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ঝাড়-জঙ্গল। চারিদিকে তাকালেই মনে হবে, এই অঞ্চলটি প্রথমের দিকে বেশ শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল।

বাইরের গোলযোগ এবং ঘটনাপ্রবাহ এর শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে নি। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সোনারগাঁয়ের গৌরবময় দিনের কোন নিদর্শনই আজ অবশিষ্ট নাই। সোনারগাঁয়ের সেই প্রাচীন রাজ্য এখন কয়েকটি গ্রামের সমষ্টিমাত্র। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত গ্রামগুলো অতীতের বিধ্বস্ত স্মৃতির সাথে যেন লগ্ন হয়ে আছে। কোথায় সেই রাজ-রাজড়াদের পাত্র-মিত্র, সভাসদ, পরিষদ আর ভৃত্যবাহিনী, কোথায় সেই বাজার, বিপনী আর শ্রেষ্ঠ সওদাগরের দল আর কোথায়-বা সেই সৈন্য-সামন্তের দল। রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ঘটনাপ্রবাহ আর জীবনের মুখরতা স্তব্ধ হয়ে গেছে এখানে। বংশপরম্পরায় লোকে এর রোমাঞ্চময় ইতিহাসের কথা শুনে এসেছে কাহিনীর মত। এ গৌরবময় ইতিহাসের মঞ্চে চাষীরা ঘর-সংসার পাতে, জন্ম নেয়, মরে যায়—অতীতে কবে কি হয়েছিল, কোথায় কি ছিল, তার ধার তারা ধারে না।

অনূদিত অংশগুলিকে নিছক প্রাণহীন অনুবাদ মাত্র বলা যায় না। মৌলিক আত্মপ্রকাশের স্বচ্ছতাও অবলীলায় গরিমাযুক্ত। মূল লেখকের আবেগের সঙ্গে অনুবাদকের সংমিশ্রিত ও একাত্ম না হলে এমনটা বোধ করি হয় না। অনুবাদকও তাঁর এ দায়িত্ব সম্পাদনে সমপরিমাণে সৃজনশীল হয়ে উঠেছেন। যথার্থ শব্দ, নিখুঁততম ভাষাভঙ্গির প্রবহমানতা সৃষ্টিতে তাঁকে যে উদ্বুদ্ধ প্রয়াসে সঞ্চালিত হতে হয়েছে তার গভীরতা আঁচ করতে পারলে সত্যই প্রশংসামুখর ও মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। বস্তুত চলতি ভাষারীতিতে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার ও ধনী উপাদানসমূহ সহজ সম্প্রীতিতে পাশাপাশি সংস্থাপিত করে অনুবাদক সমগ্র গ্রন্থটিতেই এক গুরুগম্ভীর অথচ ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষাস্রোতের প্রবাহ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাঁর এই সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখিত হওয়ার দাবিদার।

গ্রন্থটির আমরা বহুল প্রচারণা কামনা করি। মূল লেখক একজন কল্পনাশীল রসিক ব্যক্তি। প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনার শীর্ষমুখে তিনি এমন বিদগ্ধ ও রসালো মন্তব্য সংযোজনার সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন যা অনুধাবন করলে তাঁর সৃজনীপ্রতিভার প্রতি এক বিস্ময়মুগ্ধ ধারণার সৃষ্টি না হয়ে পারে না। অনুবাদেও সেই কৌতূহল উদ্দীপক রসস্রোতের এবং মার্জিত মন্তব্যের বিদ্যুৎ বিকাশের প্রতিফলন সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। তাই বলা চলে, মূল গ্রন্থের সমগ্র যোগ্যতা ও সম্ভাবনাই অনুবাদক আত্মস্থ ও প্রতিফলিত করতে পেরেছেন।*

* 'প্রাচ্যের রহস্য নগরী' 'রোমান্স অব ইস্টার্ন ক্যাপিটাল' গ্রন্থের আলোচনা।

একটি স্মৃতিকথা

পূর্ব-বাংলার পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে—হতাশায় যদি আমাদের দৃষ্টিশক্তি মুহ্যমান না হয়ে থাকে তাহলে এর কিছুটা অনুরণন অবশ্যই অনুভব করা সম্ভব। পুস্তক প্রকাশনার সুচারু মানের সঙ্গে সংস্কৃতির অগ্রগতির ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়ানো। এ পুস্তক প্রকাশনার মধ্যেও আবার এমন কতকগুলো গ্রন্থ রয়েছে, যে-সবের আবির্ভাব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দ্যোতনাশীল হয়ে ওঠে। এক দিকে এ গ্রন্থগুলো যেমন সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের বুনিয়াদ হিসেবে গণ্য হয় অন্য দিকে এগুলো তেমনি সাংস্কৃতিক উজ্জীয়নের মহামূল্যবান দলীলও বটে। রস-সংবেদনী মূল্যের সঙ্গে এসব গ্রন্থের প্রয়োজনীয় দিকটাও সমান গুরুত্ব পায়, সাংস্কৃতিক বিকাশোন্মুখ পর্যায়ের স্বেদযুক্ত অধ্যায়ের ইতিহাসও বলা চলে এসবকে।

জনাব আব্বাসউদ্দীন আহমদ সাহেবের "আমার শিল্পী জীবনের কথা" উপরোক্ত ধরনের একটি গ্রন্থ। আব্বাসউদ্দীন সাহেবের অপরিসীম জনপ্রিয়তা এদেশে কিংবদন্তীর মত। কী আবেদন সৃষ্টির প্রভাব এ জনপ্রিয়তার ভিত্তিমূলে কাজ করেছে, আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদের কাছে তার একটি স্পষ্ট আভাস তুলে ধরে। পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের মনে রসবোধের যে স্রোত যোগ্য হয়ে ছিল, আব্বাসউদ্দীন সাহেব তার স্বরূপ ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী প্রভৃতি পল্লী-সংগীতকে বৈদগ্ধ সমাজে সমাদৃত করার পেছনে জনাব আব্বাসউদ্দীনের এ অভিজ্ঞানের পরিচয় মেলে। কিন্তু সবচেয়ে আশার কথা এই যে, পল্লীর সৃজনী প্রতিভার ফল্গুস্রোতকে সাংস্কৃতিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি—জনসাধারণের রসবোধকে নাড়া দেয়ার উপযোগী উপকরণগুলোকে তিনিই প্রথম নজরুল ইসলামের সাহায্যে সংগঠিত করে জাতিগত নব জাগরণের কাজে প্রয়োগ করার জন্য সর্বান্তঃকরণে

উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন। এ প্রয়োগবুদ্ধি এবং তার ব্যবহারের মধ্যে একটি জাতির সাংস্কৃতিক চেতনার বৈশিষ্ট্য যেমন বিধৃত, তেমনি তার মানস-উত্থানের প্রচেষ্টাসমূহের পরিচয়গুলোও ঐতিহাসিক মূল্যে আমাদের অতীতকে উৎকীর্ণ করে।

আব্বাসউদ্দীন সাহেবের আত্মজীবনী আমাদের নবগঠিত জাতির উত্থানপর্যায়ের একটি সনদ সে-ই কারণে। এ পর্যায় সম্পর্কে আমাদের ধারণা ততখানি স্পষ্ট নয়। কারণ, এ সম্পর্কে ইতিহাস লেখার ব্যাপক প্রচেষ্টায় উদ্যোগ নেয়া এখনো হয় নি। আত্মজীবনী মূলত সাহিত্যঘেঁষা। ইতিহাস-মূল্যের চাইতে সাহিত্য-মূল্য এখানে বেশী। তবু সীমিত পটভূমিকায় এ গ্রন্থে যা আমরা পাই তাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। জনাব আব্বাসউদ্দীনের আত্মজীবনী এক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা পাবে। আরো স্মৃতিকথা এবং অতীত অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্যের ওপর ইতিহাস লেখা হোক। সে ক্ষেত্রে আশা করি এ গ্রন্থের অনুপ্রেরণার ঋণ কেউ হয়তো অস্বীকার করবেন না।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি বাদ দিলেও বইটির সাহিত্যিক মূল্যও নগণ্য নয়। বইটির নাম "আমার শিল্পী জীবনের কথা" সত্যই একটি শিল্পীর গভীর জীবন-তৃষ্ণা বইটিতে প্রগাঢ়ভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। শিল্পী গায়ক ছিলেন। সাহিত্যিক কুশলতা তাঁর স্বাভাবিক গুণ নাও হতে পারত। কিন্তু শিল্পীমনের আন্তরিক উপলব্ধি এই গ্রন্থে যেন সত্যপ্রকাশের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এবং এই সত্যের প্রবল শক্তিই প্রতি ক্ষেত্রে ভাষার অভিব্যক্তিকে সত্যের মতই প্রাঞ্জল, স্পষ্ট এবং জীবনরসে সঞ্জীবিত করে তুলেছে।

নজীর তুলে দিয়ে আমার উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব। কিন্তু তার বোধকরি প্রয়োজন নেই। কারণ, যে মানুষ এদেশের মানুষের প্রাণের সুরকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তা নিজের কণ্ঠে বিধৃত করে জাগরণের মন্ত্রে এ-দেশের মানুষের কাজেই অপূর্ব শিক্ষণীয় আবেদনে প্রচার করতে পেরেছিলেন, সেই মানুষের পক্ষে নিজের অত্যন্ত আপন কথাটাও তেমনি প্রাণস্পর্শী করে বলা সম্ভব—এই সামান্য স্তুতি কি আব্বাসউদ্দীনের ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি হতে পারে?

বইটি পড়ে অনেকে হয়তো অনেক বাড়তি কিছু আশা করে বসবেন। তাঁদের জন্যে আমার কিছু বলার নেই। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আমার যতটুকু

বলার তাও এই আয়তনে সংক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু সান্ত্বনা শুধু এটুকু যে, একটি চলিষ্ণু সৃষ্টিশীল মহান ব্যক্তিত্বের কর্ম-সাধনার প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সূত্রপাত হয় মাত্র, তার শেষ হয় না। জনাব আব্বাসউদ্দীন সাহেব তাঁর আত্মজীবনী দিয়ে আমাদের ঋণ বাড়ালেন মাত্র। তাঁর কাছ থেকে এইটে আমাদের উপরি পাওনা কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কী মধুময়, অমূল্য আর সর্বাঙ্গসুন্দর উপরি পাওনা এই আত্মজীবনী গ্রন্থ!*

* আব্বাসউদ্দীন আহমদের স্মৃতিকথা 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' সম্পর্কিত আলোচনা।

ঐতিহ্যের সাম্প্রতিক ব্যবহার

উইণ্ডল উইল্‌কি তাঁর 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে 'এক বিশ্বের' স্বপ্ন দেখেছেন। এদিকে কিন্তু 'বিশ্ব-রাষ্ট্র সভা' গড়ে ওঠার বদলে 'জাতি-রাষ্ট্র' চেতনাই আজ অবধি প্রখর। আজ থেকে কয়েক শ' বছর আগে রেনেসাঁর বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারী উদারচেতা ফ্রান্সিস বেকনও এমনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এক 'বিশ্ব সংস্কৃতি সভা'-র, যার নাম দিয়েছিলেন তিনি 'আইডিও পোলিশ'। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আইডিও পোলিশ'-ও নয়। কিন্তু মানুষের চিন্তা ও কাজের জগতে এ দুই ভাবধারার কোনটারই গুরুত্ব ম্লান হয় নি। বরং বলা যায়, ক্রমাগত তা বেড়েই চলেছে। দিনের পর দিন অধিকতর তাৎপর্যশীল হয়ে উঠেছে তা। আর তার ফলেই দেখা যাচ্ছে, অতি সম্প্রতিকালে ডঃ ক্লার্ক কেরর্ বা লিওনেল ট্রিলিং-এর মতো সংস্কৃতিবিদরা আন্তঃসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতার সূত্রে 'সুপার ইউনিভার্সিটি' গড়ে তোলার অনিবার্যতার ওপর জোর দিচ্ছেন—যেখানে তাঁদের ধারণায় 'বিশুদ্ধ সৃজনী প্রতিভা' মুক্তি পাবে। ঠিক তেমনি দেখা যাচ্ছে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রশ্নটিও ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির উভয় ক্ষেত্রে স্বাজাত্য বোধের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক চেতনার অবস্থিতি এ-যুগের এক বিশেষ লক্ষণ।

আমাদের সাম্প্রতিক কালের কবিতার বেলাতেও অবশ্য এ এক বিশেষ লক্ষণ। কবিতার মূল থাকে স্বদেশে। স্বাদেশিক ঐতিহ্য ব্যবহারের ভেতরই এ মৌলিকতার পরিচয়। একে কবিতার আত্মপরিচয়ও বলা যেতে পারে। যে কবিতার শিকড় তার স্বদেশে নেই, তার কুললক্ষণও নেই। কিন্তু এমন সময় আছে যখন কবিতা আত্মস্থ হয়, আত্মপরিচয়গত বিকাশ প্রশ্নাতীত হয়ে উঠে, তখন তার স্ব-সর্বস্ব স্নায়বিক তাড়নাটি আর তেমন প্রবল

থাকে না। তখন সে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের অভিসারী হয়ে ওঠে। এই যোগাযোগও সাধিত হয় বিশ্ব-ঐতিহ্যের সারাৎসার আত্মসাতের মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা কবিতা ছিল দেশ-সর্বস্ব। মাইকেল-বিহারী-লালে এসে প্রথম তা বার দরিয়ার দিকে মুখ ফেরায়, রবীন্দ্রনাথে তা পায় পূর্ণতা, হয় সংস্থিত এবং আধুনিক কালের কবিতায় এ ঐতিহ্যিক যোগাযোগ পরিণত হয় এক স্বাভাবিক লক্ষণ এবং আচরণে। বস্তুত লক্ষণীয় যে, এমন বিশ্ব-সঞ্চরণে মুক্তির স্বাধিকার রয়েছে। কবিতায় পরিণতি না এলে এ মুক্তি অর্জিত হতে পারে না। এবং বলা বাহুল্য, শিকড় যেখানে যতো শক্ত, মুক্তির গুণও সেখানে ততো রাহুমুক্ত, সমৃদ্ধ।

আমাদের সাম্প্রতিক কবিতায় বাংলাদেশ নতুনভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে, দেখা যায়। যেন স্বদেশের পুনর্জন্ম হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, আধুনিক কবিতার স্বেচ্ছা সঞ্চরণক্ষম অর্জিত মুক্তি বুঝি হঠাৎ করে এ-সময়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা তা নয়। বরং এর পেছনে কিছুটা সমাজতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক কারণ রয়েছে। আমাদের স্বাজাত্যবোধ সম্প্রতি নিপীড়িত এবং ক্ষুণ্ন। এরই প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশ পুনর্নির্মাণের এক আলোড়ন। ঠিক 'জাতিরাষ্ট্র' প্রবণতা এ-সময়ে যে-কারণে প্রখর, কবিতার এ অসময়োচিত আত্মপরতার তীব্র হয়ে ওঠাও সে কারণ থেকে আদৌ দূরে নয়। বরং মূলগতভাবে এক। সুতরাং আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার আত্ম-উৎক্ষেপের প্রাবল্য বা প্রাধান্য আধুনিক কবিতার অর্জিত বিশ্বজনীন স্বভাবের বা মুক্তিগুণ সম্পন্নতার বিপরীত নয়। বরং 'এ' স্বাধিকারের বা মুক্তির সঙ্কট থেকেই উদ্ভূত। তা'ছাড়া সাম্প্রতিক কবিতার বিশ্বসংলগ্নতা যে স্বভাবজ হয়ে উঠেছে, তারও স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে যখন দেখা যায়, আজকালকার কবিতায় দেশজ আলোড়ন আদৌ দেশ-সর্বস্ব নয়, তা-ও আন্তর্বিশ্বের সহমিলনে পরিব্যাপ্ত, পরিস্রুত এবং পরাক্রান্ত। এ উক্তিরই সত্যতা প্রমাণসিদ্ধ হয়ে ওঠে ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি সিন্দবাদ' আবাহনে, সৈয়দ আলী আহসানের দেশকালাতীতে 'আমার পূর্ব বাংলা'র উদ্বোধনে, আহসান হাবীবের 'এ-মন এ-মৃত্তিকা'র স্বরূপ সন্ধানে, শামসুর রাহমানের 'ইথাকায়' এ দেশ এ-মাটিরই উদ্ভাসনে। সিন্দবাদকে আবাহন করে ফররুখ আহমদ দেশবিরাগী হয়ে ওঠেন না, বরং দেশাতীত ঐতিহ্যের সংরাগে এ মাটির প্রাণান্তিক প্রয়োজনকেই তীব্রতর করে তোলেন। সৈয়দ আলী আহসানের বিশ্বপরিক্রমা পূর্ব-বাংলার নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা অচ্ছেদ্য

প্রেমেই সমর্পিত হয়, অভিভাবকহীন ইথাকা শামসুর রাহমানের দেশজ ভবিষ্যৎ ভাবনারই আকুল দিগদর্শন মাত্র। ফররুখ আহমদ থেকে শামসুর রাহমান পেরিয়ে অতি-সাম্প্রতিক কবির ইদানীং মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের সঙ্কটের স্বরূপ মূলগত ভাবে পাল্টায় নি। সে-কারণেই দেশজ উদ্বেলতার এ আধিক্য এবং দীর্ঘসূত্রতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে যে কবিতার বিবর্তন আটকায়নি এবং সে উত্তরণ যে উৎকর্ষমুখী হওয়ার পথেও স্থবিরতা আক্রান্ত হয় নি, তারও এক বড় প্রমাণ বোধ হয় আমাদের আজকের কবিতায় দিগন্তছেঁড়া মুক্তিবোধের এমন সহজাত, অবিচ্ছিন্ন এবং ধারাবাহিক উপস্থিতি।

দেশ-সম্পর্কের মতো ব্যক্তি সম্পর্কের বেলাতেও ঐতিহ্যের ব্যবহারে একই সঙ্গে শিকড়সংলগ্নতা এবং মুক্তির সাবলীল উপস্থিতি এ-যুগের কবিতার এক সাধারণ লক্ষণ। বস্তুত কবিতার এ ধরনের ঋণের স্বরূপ একমাত্র ঐতিহ্য রূপায়ণের মধ্যেই ধরা পড়ে। জীবনানন্দ দাশের একটি বহুপঠিত কবিতার কয়েকটি চরণ এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যাক:

> চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
> মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, অতিদূর সমুদ্রের পর
> হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
> সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
> তেমনি দেখছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন'
> পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

কবিতাটি আধুনিক কালের। এর অন্বিষ্ট এক বাঙালী নারী, যার চোখ পাখীর নীড়ের মতো গৃহাশ্রয়ের প্রতীক। কিন্তু সে নারীর চুল কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা এবং তার মুখশ্রী শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সমন্বয়ে বাংলার বাইরে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যে তাকে খুঁজে পেয়ে বন্দরে সংস্থিত, তার চোখও বিশ্বপর্যটক নাবিকের, যে নাবিক প্রাপ্তির শীর্ষ মুহূর্তেও দারুচিনি দ্বীপের ভেতরই সবুজ মাটির দেশ দেখার সঙ্গতি খুঁজে পায়। দেশ ও দেশাতীতের এই যে আত্মস্থ উপায়ন এতে বাংলা কবিতার হাত-পা বড় হবারই সাবালকত্ব লক্ষণ বোঝা যায়। অবশ্য বাইবেলেও ঐতিহ্যকে এমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়:

> Her nose is like the tomb of Nazereth
> Faceth towards Demascus,
> Her breasts are like twin rose

Her eyes are like the fishes
In the ponds of Hespoon.

এখানেও নারীর রূপ বর্ণনা দেশান্তরের ঐতিহ্যে গ্রথিত। কিন্তু জীবনানন্দের মনোভাবের সঙ্গে বাইবেলের এ-রূপায়ণে পার্থক্যও আকাশ পাতাল। বাইবেলের এ স্তবকের লক্ষ্য ধর্মীয় ঐতিহ্যে নিবদ্ধ, এখানে স্বাধীনতা নেই, প্রবর্তক বিশ্বাসের কেন্দ্রিকতাই এর মূল সুর, উদ্বুদ্ধ চারিত্র্য। পক্ষান্তরে জীবনানন্দে ঐতিহ্যিক সাযুজ্য ব্যক্তি-সম্পর্কে মুক্তিপ্রাপ্ত। ধর্মের নির্দিষ্ট লক্ষ্য রূপায়ণে এর তো বদ্ধদশা নয়-ই, বরং নিজস্ব রুচি, ধ্যান-ধারণা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার শিহরণে এ স্বেচ্ছাবিহারীও। আধুনিক কবিতার এই যে নিগড় থেকে ছাড়া পাওয়া, এর ফলে কবিতা আর উদ্দেশ্য-বিশেষের চারণ-মাত্র থেকে নি, হয়ে উঠেছে শিল্পীর হাতের যাদুদণ্ড, অধিকতর সৃজনধর্মী। ঐতিহ্যের ব্যবহারে স্বাধীনতা অর্জনই কবিতাকে এ শক্তি দিয়েছে। খাঁচার তোতাকে করে তুলেছে আকাশচারী শুক, বিশ্বজ্ঞানী সিদ্ধবাক ব্যাঙ্গমা, অথচ ঘরের পথ তার ঠিকই চেনা, স্বদেশের রঙ-ও তার গা থেকে বিলুপ্ত নয়।

পূর্ব-বাংলার কবিতা আজকাল স্বাদেশিকতার ক্ষিপ্র উল্লাসনে উতরোল এবং ব্যক্তিসম্পর্কের উদ্ঘাটনে সে শুধু অকুণ্ঠ নয়, ক্ষেত্রবিশেষে বেপরোয়াও। সে সঙ্গে জীবনের সামগ্রিক তাৎপর্যও এ অনুধাবন করতে চাচ্ছে—কখনো বিশ্লেষণে, কখনো তীর্যক ব্যাখ্যায়, কখনো ব্যাঙ্গাত্মক অসহিষ্ণুতায়। আত্মজৈবনিক রহস্যের উন্মোচনও আবার ইদানীংকার কবিতার এক বিশেষ ধারা। কিন্তু সর্বত্রই দেখছি ঐতিহ্য ব্যবহারে দেশ বা আত্মসর্বস্ব স্বয়ং-সম্পূর্ণতার শুচিবায়ুগ্রস্ততা কোথাও নেই। এ-দেশের আবহমানকাল এ আকণ্ঠ গ্রাস করে নিয়েছে, সে সঙ্গে আকর্ণ বিস্তৃত করেছে আবিশ্বশোষক মুখও। এই অধিকতর তাৎপর্যশীল জীবনীশক্তি কবিতার সৃজনধর্মকে কেবল বেড়ার সীমাবদ্ধতাকে ভেঙেই ক্ষান্ত হতে দিচ্ছে না, এর চেতনাকে করে তুলেছে অনেক বেশী অস্থির, অনুসন্ধিৎসু এবং অন্বেষণ-উন্মুখ। ফলে কিছু-দিন আগেও যেমন অনেক কবি সরল, নিঃশঙ্ক মীমাংসিত এবং শান্ত উচ্চারণ করতে পেরেছেন ঐতিহ্যের সুস্থির সংগ্রহশালায় বসে, যেমন শুনতে পেয়েছি জসীমউদ্দীনের কণ্ঠে :

ও-যেন কথার গীত-গোবিন্দ, হাফেজের বুলবুলি,
ওরি মাঝে বসি পাখায় মাথায় তারা গুঁড়ো করা ধূলি

একখানি হাসি। বাঁকা তরী বেয়ে এসেছে ঈদের চান্,
যেন তারি গায়ে লেখা রহিয়াছে ভেস্তের ফরমান।

তেমন সরল উচচারণ বুঝি এখানকার কোনো কবির পক্ষেই আর সম্ভব হবে না। তীর্যকতা, পূর্বাপর কার্যকারণ ব্যাখ্যা বা সঙ্গতিবিধান, বা তাৎক্ষণিকের আক্ষেপ ঐতিহ্যের তিলোত্তমা ঠাসবুনিতেও রাগী যুবকের মতো অনুপ্রবেশ করছে। তা সিকান্দার আবু জাফর, সানাউল হক, আবদুল গনি হাজারীর হাতেই হোক, কী শামসুর রাহমান, আল-মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, শহীদ কাদরীর হাতেই হোক। মাতৃভূমির ঐতিহ্যনির্ভর রূপবর্ণনার পুনরাবৃত্তির ছলে সিকান্দার আবু জাফর যখন নিষ্ঠুর ব্যাঙ্গার্থ-উক্তিতে আর্তকণ্ঠ হয়ে ওঠেন, তখন যেমন, আবদুল গণি হাজারী যখন নববান্ন উৎসবে অন্নপূর্ণার উপাচার বাসী হয়ে গেছে বলে বিদ্রূপে মথিত হয়ে উঠেন, তখনও তেমনি আজকালকার কবিতায় ঐতিহ্য ব্যবহার বিভিন্ন সময়োচিত ও ব্যক্তিগত উত্তেজনা ও ইংগিতের আঘাতে টলমল করতে থাকে, যাকে আর আগের মতো নিরুদ্বেগ এবং সংহত কিছুতেই মনে হয় না। অর্থাৎ কিনা ঐতিহ্যের সীমানা ভাঙার পরেও ঐতিহ্য ব্যবহারে ভিন্নতর পরিণতির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, হয়তো এইটে বয়েস বাড়ারই লক্ষণ।

এ পরিণতির পথ কাটা কীভাবে চলছে, শামসুর রাহমানের কয়েকটি পংক্তির সাহায্যে তা বোঝার চেষ্টা করা যাক :

মনে হয় আমি যেন সেই লোকশ্রুত ল্যাজারস,
তিন দিন ছিলাম কবরে, মৃত—পুনর্জীবনের
মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে।
পোশাকের জেল্লা তবু পারে না লুকোতে কোনো মতে
বিকৃত দেহের ক্ষত, লোবানের ঘ্রাণ সহজেই
ডুবে যায় প্রাক্তন শবের গন্ধে, নীল আঙ্গুলের
প্রান্তে বিদ্ধ তিনটি দিনের ক্ষমাহীন অন্ধকার।

হয়তো নিজস্বতার বৃন্তে ফলিত আপামর যন্ত্রণার এই অবিমিশ্র ঐতিহ্য-গ্রথিত গভীর ভাষা যন্ত্রণা থেকে মুক্তির কথাই বলে। সে বলাতে নিজের দিকে অঙ্গুলি সংকেত আছে, আছে পর্দা অপসারণের ইংগিতও, আছে বর্তমানের জটিলতার ওপর কবির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া ও বিশ্লেষণ আরোপের বয়স্ক লক্ষণ এবং সবার ওপরে আছে শিকড় ও মুক্তি তথা দেশ ও দেশাতীতের যোগ একই

সঙ্গে। এই-ই হয়তো 'আইডোপোলিসে'র পথ। অধিকতর পরিণতি অধিকতর জট খুলে, পেছুনটান উপরে ফেলে এভাবেই হয়তো স্বতন্ত্র সাংস্কৃতি-বিশেষকে 'বিশ্ব সংস্কৃতি সভা'-র যোগ্য করে তুলছে। এবং এ পথের 'পাথেয়' যে ঐতিহ্য ছাড়া আর কিছুই নয়, তা বলাই বাহুল্য। হোক না তা সিন্দবাদ, কী ইথাকার টেলিমেকাস কিংবা আল্-মাহ্ মুদের ভাষায়: 'উষ্ণ বয়সিনী এই বঙ্গনাম্নী বৈষ্ণবীটি'।

পুনরুজ্জীবিত রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তার সময়কালের সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। 'রক্তকরবী'-তে তাঁর এ ধারণার এক সংহত রূপ আছে। 'রক্তকরবী'র দেশে প্রজারা রাজাকে দেখতে পায় না। তিনি সুদূর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এক অদৃশ্য অথচ সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব। কারো নাগালের সীমায় তিনি নন; অথচ তাঁর ইচ্ছের বাইরে এক পা-ও চলবার জো নেই সেখানে। রাজার এই একচছত্র লীলার রাজ্যে প্রজারা সব সংখ্যা মাত্র, মানুষ কেউই নয়। রাজা তাঁর প্রয়োজনে প্রজাদের খাটিয়ে চলেছেন অহরহ নির্বিচারে। প্রয়োজন ফুরোলে ছোবড়ার মতো উপরিয়ে ফেলে দেন, ফিরেও তাকান না। এরই মাঝখানে রয়েছে কিছু লোক, যারা রাজার দরকারে প্রজার ইন্ধন জুগিয়ে দেবার কাজ করে থাকেন। আর শুধু এঁদের রয়েছে পদবী—নিজস্ব পরিচয় চিহ্ন। রক্তকরবীর রাজ্যে কেবল এরাই সংখ্যা নন। রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যবস্থা মানতে পারেন নি। 'রক্তকরবী'তে এ-ব্যবস্থা পাল্টানোর শোর তিনি তুলেছিলেন। নন্দিনীর ঝড় বইয়ে এই অমানবিক বিধি-বিধানের আড়াল ভেঙে রাজাকে নামিয়ে এনেছিলেন সর্ব-সাধারণের মেলায়, মিলিয়ে দিয়েছিলেন মানবিকতার অবারিত স্রোতে। রবীন্দ্রনাথ নিপীড়ণমূলক এবং অসম্মানজনক পরিবেশ মাত্রেরই বিরুদ্ধে ছিলেন। 'রক্তকরবী' তাঁর মনোভাবের এক পূর্ণাঙ্গ বাহন। প্রচলিতের বিরুদ্ধে বিপ্লব বা বিদ্রোহ এবং পরিবর্তিত সমাজ কাঠামোর স্বরূপ সম্পর্কে রাবীন্দ্রিক ধারণার উভয় দিকই তাই 'রক্তকরবী'তে প্রতীকী সত্যে রূপায়িত বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

এখন এমন এক সময় এসেছে, যখন বিচার করে দেখার দরকার, রবীন্দ্রনাথের এই ধারণাগত উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা কতটুকু এগুতে পারি, সমাজ পুনর্বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষিত ফল তাঁর এ বিধান প্রয়োগ করে কতটক

আমরা পেতে পারি? অন্যায় ও শোষণের নিগড়ে বদ্ধমূল অচলায়তন ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন. সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি তাঁর ভাঙন-পরবর্তী 'ইউটোপিয়ায়' রাজাকে নির্বাসিত করতে পারেন নি, রাজার উত্তরাধিকার—লালিত আসন উৎখাত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি বরং মানবিক সংশোধনের প্রলেপে রাজাকে পুনর্বাসিত করেছিলেন। ম্যাকিয়াভেলির 'প্রিন্সে'-র পরিবর্তে 'বেনিভোলেন্ট রাজার' বাঁচোয়ার উপায় নির্ধারিত করেছিলেন, শাসন-উৎসের আত্মরক্ষার আপোষ-বিহিত তুলে ধরেছিলেন। 'রক্তকরবী'-তে তাই থিসিস এ্যান্টিথিসিসের মুখোমুখি সংগ্রামে সিনথিসিসের জন্ম হলো না—থিসিসেরই সংশোধিত পুনর্বহালে যা আছে তারই শেষ রক্ষার উপায় নির্ধারিত হলো। কিন্তু বর্তমান সময় সিনথিসিসের আবির্ভাবের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছে এবং এই অস্থিরতার আলোড়ন রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের ভেতরেই তুমুল হয়ে উঠতেও আমরা লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রনাথের আগাম বুদ্ধি সে বিষয়ে সচেতনও ছিল পুরোমাত্রায়। অচলায়তনের দাদাঠাকুরের ভাষায় তা তিনি বলেওছেন, নতুন দেয়াল ভাঙার দরকার হতে পারে বলে আভাস দেয়া হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব বোধ করি এই যে, তিনি তার চরিত্রে ও চেতনার কোথাও বদ্ধমূলতার শিকার ছিলেন না। বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে তাঁর পারিপার্শ্বিক অচলপট ভেঙে ফেলার অপরিহার্যতায় তিনি নিঃশঙ্ক ছিলেন। কিন্তু যখনই দেখলেন ভাঙনের পরবর্তী সংগঠনে তার ধারণাই শেষ কথা হতে পারে না, তখনই তিনি তাঁর নিজের ভূমিকার অবসান উপলব্ধি করে নেতৃত্বের আহ্বানে সচকিত করে তুলতে চাইলেন তাকে, 'যে জন কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, যে আছে মাটির কাছাকাছি'। 'মাটির কাছাকাছি', কোন কবি এ যুগের নেতৃত্বের পুরোভাগে স্থান দখল করতে পেরেছেন কিনা, জানা নেই; তবে নতুন সমাজ গঠনের শর্তাবলীতে যে রাবীন্দ্রিক বিধান অচল, এ-কথা আজ আর বোধ করি বিতর্কের বিষয় নয়। কিন্তু তাই বলে রাবীন্দ্রিক-মূল্য এবং প্রেরণা বিন্দুমাত্রও কমেনি, সে-কথাও আমাদের স্পষ্ট করে জানা দরকার।

কীভাবে সমাজ এবং শাসন-কাঠামো গড়লে সর্বমানুষের কল্যাণ স্থির নিশ্চিত হবে, স্খালনাতীত হবে, তাই নিয়ে বিধি-বিহিতের উদ্ভব। এক না টিকলে আর এক আসবে। এই আকাঙ্ক্ষিতকে প্রতিষ্ঠিত করাও চলবে।

কিন্তু যে মানবিক বোধ এ আকাঙ্ক্ষিকতকে প্রতিষ্ঠিত করার তাড়নায় অক্ষুণ্ন উৎস হয়ে রয়েছে, তা-ই হলো সবচেয়ে বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ এ সকল সক্রিয় প্রত্যক্ষ মানবতাবোধ আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর এ বোধ আমাদের ভাঙনের প্রয়োজন বুঝিয়েছে, সর্বজনীন কল্যাণ-আর্তির অপরিহার্যতায় সমূলে নাড়া দিয়েছে। কল্যাণ প্রতিষ্ঠার বিধানটি তাঁর টিকলো, কী টিকলো না, তা আদৌ বড় কথা নয়, কল্যাণের তাগিদে তিনি যে আমাদের উদ্যত করতে সক্ষম হয়েছেন সেই-তো সবচেয়ে বড় পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সক্রিয় মানবতাবোধ দিয়ে আমাদের স্থবির পায়ে গতির সঞ্চার এনেছেন, স্তব্ধ হাতে অচলায়তনকে আঘাত করার যোগ্য শাস্তির শিহরণ জাগিয়েছেন। তাই তিনি আমাদের অগ্রযাত্রার উৎস। তাঁর মানবিক কল্যাণবোধ আমাদের চোখ দিয়েছে খুলে, সচল হওয়ার মন্ত্রে আমাদের অচেতনার ঘুম চিরতরে দিয়েছে তাড়িয়ে—এই তো তাঁর কাছে আমাদের প্রথম ঋণ, অপরিশোধনীয় ঋণ, প্রেরণার ঋণ, উৎসের কাছে অবিরাম গতির ঋণ।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের দ্বিতীয় ঋণ, নির্মোহ মুক্তবুদ্ধির শিক্ষা। কোথাও তিনি বদ্ধমূলকতায় 'পথ রুধি' আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান নি, তাঁর বিশাল ছায়া দিয়ে আমাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে একবারের জন্যেও আচ্ছন্ন করেন নি। তাই তাঁরই দেয়া 'রক্তকরবী'র বিধান তাঁরই জীবনের শেষ সীমায় তাঁর চোখেই যখন অর্থহীন হয়ে ওঠে, তখনই আরো অর্থময় বাণীর উদ্গাতাকে যোগ্যতার নেতাকে ডাকতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না তাঁর। প্রয়োজনের এ স্বরূপও রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন এবং সাড়াও দিয়েছিলেন তৎক্ষণাৎ। নিজের ধ্যান-ধারণায় বন্দী তিনি কখনো হন নি এমন নির্মোহ বদ্ধমূলকতা-মুক্ত কল্যাণবুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড আশীর্বাদ আমাদের সম্মুখ যাত্রার সবচেয়ে বড় পাথেয়, আত্মসংশোধনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। এ ঋণ যত আমাদের মনে থাকবে, তত আমাদের নির্ভুল পা ফেলার দিশা পাব খুঁজে।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যে রূপান্তরিত এবং তিনি মতও বটে। আমার কেবলই মনে হয়, তাঁকে স্বেচ্ছাধীনে অন্তর্গত করি, ঠিক যেমন উপমাকে করা যায়, ঐতিহকে করা যায়। অনেকটা কুশল প্রশ্নের সহজতায় আপন খুশীর খোলা-মেলায় পাওয়ার মতো। তার যতটুকু নেবার নেব। যতটুকু নেব না, নেব না। যখন ইচ্ছে তখনই তার অজস্রতায় বুঁদ হতে পারব, আবার

মুক্তও হতে পারব স্বেচ্ছায়। কেবলই ইচেছ্‌ হয় রবীন্দ্রনাথ তেমন নির্যাসে পরিণত হোন। আগাগোড়া সুখদ সদর্পে বেঁচে থাকুন, ঠিক অমৃত যেমন করে অক্ষয় সামান্যেও অপরিমেয় হয়। কিন্তু আদতে দেখছি, রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত ব্যাপারটা এখনো মোটেই তা নয়। রবীন্দ্রনাথ একটুও মরেন নি, বরং সম্পূর্ণ অস্তিত্ব নিয়েই আমাদের পুরোভাগে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন সর্বস্ব অনিবার্য সার্বক্ষণিক পুরোপুরি জীবন্ত। স্বাভাবিক ঐতিহ্যিক সারাৎসারে লীন হওয়ার বদলে এই যে আপাদমস্তক রবীন্দ্রনাথের খরতপ্ত পুনরুজ্জীবন, সর্বাংশে প্রত্যাবর্তন, এইটেও ঘটেছে আমাদের পরিবেশেরই গুণে। আজকাল আমাদের সংস্কৃতির পায়ে বেড়ি পরানোর দুর্বার চেষ্টা চলছে। শতপাকের সংস্কারে আমাদের আবদ্ধ করে ফেলতেই এ আয়োজন। নিষেধের শিকলে বেঁধে আমাদেরকে বদ্ধমূল কোনো ইচেছ্‌ বিশেষের ক্রীড়নকে পরিণত করতেই এই প্রয়াস। মুক্তির প্রতীক রবীন্দ্রনাথ তাই বোধ করি এই দ্বন্দ্বের পুরোভাগে না এসে পারেন নি। বাঁধন ছেঁড়ার মন্ত্র তাঁর চেয়ে আর কে ভালো জানে? বদ্ধমূলকতার শিকড় উপড়ানোর নির্বিকার নির্মোহ শিক্ষা তাঁর চেয়ে ভালো আর কে দিতে পারে? তাই হয়তো সমূল রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশাল বিপুল পরিপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে, ডান-বাম মথিত আন্দোলিত অস্তিত্ব নিয়ে পুরোপুরি সজীব হয়ে আবার ফিরে এসেছেন।

মনে হয়, জীবন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি, হয়তো আরো কিছুকাল থাকবে। ঐতিহ্যের অবিনাশী নির্বাস হয়ে ওঠার আগে হয়তো আরো কিছুকাল এই প্রকাণ্ড মহীরুহের সবটুকুই আমাদের বহন করে যেতে হবে। কারণ, সংগ্রাম যখন বন্ধনের বিরুদ্ধে, তখন মুক্তি সনদের কোন অংশই বর্জনের ঝুঁকি আমরা নিতে পারিনে। তাছাড়া বর্জন নয় কোনক্রমেই, বিচারেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

কাব্যে আধুনিকতা : লক্ষণ

আধুনিক কথাটা আমরা এমনভাবে ব্যবহার করি, যেন এই শব্দটা আমরাই তৈরি করেছি—এই হালে, অতি সম্প্রতি। এর আগে কেউ আর এর ব্যবহার জানতো না, মানেই জানতো না অনেকটা এমনিভাব যেন অনেকের। কিন্তু ব্যাপারটা আদতে তাতো নয়। আধুনিকতার ওপর আমরা আজকাল যেমন জোর দাবি খাটাচ্ছি, আগের যুগের লোকেরাও তেমন আধুনিকতা নিয়ে তোলপাড় করে গেছেন। তারও আগের যুগের লোকেরাও তেমনি। তবে তাই বলে এমন দাবি তোলা মুশকিল যে, পৃথিবীর বয়েস আর আধুনিকতা নিয়ে সজাগতার ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা নিশ্চয়ই আছে এবং সেই সূত্র ধরে হয়তো বলা যেতে পারে, মানুষ যখন থেকে সমাজসজাগ হয়ে উঠেছে, তখন থেকেই আধুনিকতা সম্পর্কে সচেতনতারও শুরু।

বাংলা কবিতার বেলায় এক সময় বিহারীলালকে আমরা আধুনিক বলে চিহ্নিত হতে দেখেছি। অত্যাধুনিকতার শিরোপায় রবীন্দ্রনাথও কম বিশেষিত হননি, স্বতন্ত্র অঙ্গুলিসংকেতে তাকে সে সময়ে দলছুট বানিয়ে একঘরে করার চেষ্টাও কিছু কম হয় নি। তারপর নজরুল আধুনিকতার আরেক নতুন সোরগোল তুললেন। তারও পর আরও এক নতুন আধুনিকতার পালা বদল যা এলো তার সূত্রপাত ত্রিশের যুগ থেকে। আধুনিকতার সে আবহাওয়াই কিছু ভোল পাল্টে, কিছু মেজাজ বদলের টানাপোড়েনে, কিছু রঙ ছড়াবার বিদ্রোহে কী বক্তব্যের আকস্মিক আঘাতে কী হুজুগে আজ পর্যন্ত মূলত বাংলা কবিতার দিগন্ত জুড়ে স্থায়ী হয়ে আছে। আধুনিকতা সম্পর্কে বিরাগ রবীন্দ্রনাথের কুশলী হাতই অনেকটা মুছে দিয়েছিল। নজরুলের আধুনিকতা নিয়ে তো এক কালে সারা দেশময় মাতামাতির ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু সত্য বলতে কী, ত্রিশের

পরবর্তী বাংলা কবিতার আধুনিকতা দেশীয় রসবোধের সঙ্গে সোনায় সোহাগা যোগ স্থাপন করতে এখনো পুরো সিদ্ধিলাভ করেছে, এমন বলা যায় না। এর কারণ খুব যে একটা অজ্ঞাত, তা নয়। এ বিষয়ে বলা যায় যে, বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে কেউই আধুনিকতাকে তখনকার দেশজ মননসীমার চৌহিদ্দি ছাড়িয়ে বেশী দূর নিয়ে যান নি। ফলে পাঠক আর সে সময়কার কবিদের মধ্যে সন্ধি হতে খুব দেরি হয়নি। আর নজরুল তখনকার আধুনিক মনের বড় এক চাহিদার রূপকার হয়ে উঠেছিলেন বলে, ভিনি ভিডি ভিসির বৈজয়ন্তী ওড়াতে তার পক্ষে একটুও বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু নজরুলের পরের আধুনিক কবিরা যে আধুনিকতার দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তা ছিল অনেক বেশী গুরুতর। সেটা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, দেশের সঙ্গে আন্তঃদেশের যোগ, জাতির সংগে আন্তর্জাতিক, ব্যক্তি-মানুষের ভাবনার সঙ্গে বিশ্বমানুষের ভাবনার—ব্যষ্টি আর সমষ্টির যোগ-বিয়োগে লোক এবং শ্রেণীর মানসাঙ্ক। আর এ-সবই অবিচ্ছিন্ন—দেশ-কাল-পাত্রের বিশালত্বে সংস্থাপিত। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে সরল বিশ্বভাবনার সঙ্গে এই দিগন্ত ছোঁড়ার প্রধান পার্থক্য এই যে, এমন যে নতুন আধুনিকতার উত্তরাধিকার তা দার্শনিক যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশী বাস্তব। আগের কোনো কবিতার মত এ আদৌ সরল নয়—বরং বড্ড জটিল। কাব্যিক উল্লাসে মোটেই এ আত্মসর্বস্ব ও ঊর্ধ্বচারী নয়; বরং বড়ই বহুজন সম্পর্কিত, হিসেবী ও জাগতিক। কল্পনা, উপমা, রূপক, ছন্দের ঝঙ্কার ও মিলের মাধুর্যে যতই তা মনোহারী রূপ নিক না কেন—ভেতরের স্বভাবটা তার ঐ রকম এবং তাই তাকে বুঝতে বড় কষ্ট। কেননা, যে হিসেবের কড়া ধোপে আমরা দুনিয়ায় চলছি, সেই হিসেবের চালে রূপময় কবিতাও যে কতো পারঙ্গম হয়ে উঠেছে, সে যোদ্দা হিসেব পুরো মিলাতে পাঠকের এখনো কিছুটা বাকী আছে।

ইদানিংকার বাংলা কবিতার দুরূহতার বিষয়ে পাশ থেকে বলতে গিয়ে এ-যুগের আধুনিকতার স্বভাব সম্পর্কে কিছু আভাস হয়তো দিয়েছি। এই স্বভাবের স্বরূপটা ধরতে পারলে এ-যুগের আধুনিক কবিতার লক্ষণও আঁচ করা যেতে পারে। জাগতিক ঘটনা ও তার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টির ঘনিষ্টতায় আধুনিক কাব্যের যে বহুধাসংলগ্ন স্বভাবের পরিচয় আমরা খুঁজে পাই, তার মূলে কাজ করছে পরিপার্শ্ব ও পরিপ্রেক্ষিত চেতনার সমন্বয়ে

স্পষ্ট যুগধারণা। এই যুগধারণা বা যুগচেতনা এবং পরিপার্শ্বের সঙ্গে একাত্মবোধজনিত সক্রিয় চিন্তাই আধুনিক কবিতার প্রধানতম লক্ষণ। এই মনোভংগীর বহিঃপ্রকাশে আধুনিক কবিমাত্রই তীক্ষ্ণতম যোগ্যতম আধুনিকতম রূপাধার খুঁজে নিতে তৎপর। যোগ্য আঙ্গিক এবং সঙ্গত কাব্যকে সজ্জিত করা সম্ভব না হলে যুগের অগ্রসরতম ভাবনার লক্ষ্য ও সক্ষম প্রতিফলন সম্ভব নয়। এ কারণেই শব্দ ব্যবহার ও আঙ্গিকেরও এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে নানাভাবে আজকের আধুনিক কবিতায়। অনেকেই মনে করেন, শব্দ, উপমা এবং আঙ্গিকের অভিনবত্বই বুঝি আধুনিকতা। এ যেন প্রাণ ফেলে দেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি, মনোভাবটা আদৌ লক্ষ্য না করে উপাচার উপঢৌকনের জৌলুস নিয়ে মাতামাতি। অন্তহীন পরিপার্শ্বের সঙ্গে ব্যক্তি মনের নিবিড় ও অপরিহার্য যোগ যেমন কোনো আধুনিক কবিকে এক ভাবনায় স্থির হতে দেয় না, তেমনি এক সিদ্ধান্তের লক্ষ্যেও মোক্ষ লাভের স্বস্তি দেয় না। এ শতদল পদ্মও নয় যে, মাত্র একশতটি পাপড়ির সন্ধান পেলেই পদ্মের সব জানা হবে। বিশ্বনিয়ম অন্তহীন দল মেলছে ক্লান্তিহীন উদ্বেগে। তাই আধুনিক কবির স্বাতি-ভ্রমণেরও আর শেষ নেই। এই দুরূহতম দায়ভার কাঁধে তুলে নেয়া মাত্রই কাব্যের বাহন আর কাঠামোকে অর্থাৎ শব্দ আর আঙ্গিককে কেবলই নতুন নতুন করে গড়তে হচ্ছে, তবু প্রয়োজন মেটে না। কেননা, আরো সূক্ষ্মতর ভার বহনের উপযোগী তাকে হতে হবেই, অথচ সেই সঙ্গে আরো সুন্দরও তার হওয়া চাই। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল—বিশেষ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশেষ শব্দ ও আঙ্গিক প্রকরণে তাঁরা তাঁদের প্রকাশক্ষুব্ধ আবেগের নিঃসরণের স্বস্তি এক এক পর্যায়ে খুঁজে পেতেন। কিন্তু আধুনিক কবিতাবিশেষর শুরু ও শেষ কোথায়? তা যে অবিচ্ছিন্ন ঘটনাচক্রের প্রতিফলন অংশমাত্র। এর রূপময় শব্দ-প্রবাহও নতুন মোড় নেয়া স্রোতস্বতী ছাড়া আর কি। আর তার ফলেই একজন আধুনিক কবি যখন একজন খঞ্জ কি কুষ্ঠরোগী, কি সাইকেলচারী এমনকি নিজের মাতা-পিতা-বোনকে নিয়ে কবিতা লেখেন, তখনও তা আর নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা বিষয় কেন্দ্রিক কাব্য হয়ে থাকে না—তা পরিপার্শ্বের বহুধায় বিলীন হয়ে যায়, সর্বজনের ভাষায় সচেতন প্রতীকে মুখর হয়ে উঠে, স্বয়ংসম্পূর্ণতা হারিয়ে যুগের প্রতিনিধিত্বের অন্তহীনতায় মিশে যায়।